নারী ও কৃষি-প্রতিবেশ

সুরাইয়া বেগম

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ

নারী ও কৃষি-প্রতিবেশ

সুরাইয়া বেগম

RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG
SOUTH ASIA

নারী ও কৃষি-প্রতিবেশ

অশ্লেষা খাডসে রচিত এবং ফোকাস অন দ্যা গ্লোবাল সাউথ, ভারত থেকে প্রকাশিত "উইমেন, এগ্রোইকোলজি এন্ড জেন্ডার ইকুয়ালিটি" অবলম্বনে লিখিত

Women and Agroecology

Translation and adoption of the book "Women, Agroecology & Gender Equality", Author- Ashlesha Khadse and published by Focus on the Global South, India

সুরাইয়া বেগম

Suraiya Begum

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর, ২০১৭

Published in: December, 2017

প্রকাশনায়:
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ (রিইব)
বাসা ৫৪ (৩এ), সড়ক ১১, ব্লক এফ,
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
ফোনঃ (+৮৮০-২) ৫৫০৪২৩৪৫-৬
Email: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

Published by:
Research Initiatives, Bangladesh (RIB)
House 54 (3A), Road 11, Block F,
Banani, Dhaka- 1213, Bangladesh
Phone: (+880-2) 55042345-6
E-mail: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

সহায়তায়:
রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং
ফ্রাঞ্জ-মেহ্‌রিং-প্লাটজ্ ১
১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী
Website: www.rosalux.de,
www.rosalux-southasia.org

Supported by:
Rosa Luxemburg Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin, Germany
Website: www. rosalux.de
www.rosalux-southasiaorg

মুদ্রণে:
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড
গ-১৬, মহাখালী, ঢাকা-১২১৩

Printed by:
Dana Printers Limited
Ga-16, Mohakhali, Dhaka-1213

ছবি ঃ প্রচ্ছদ, ফ্রন্ট ইন এবং ব্যাক ইন
চৈতন্য কুমার দাস

Picture: Cover, front in & back in
Chaitonno Kumar Das

Sponsored by the Rosa Luxemburg Foundation e.V. with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany

Gefördert durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V. aus Mitteln des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) জার্মানীর রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং (আরএলএস)-এর সহায়তায় গত ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশে বিভিন্ন ইস্যুতে গবেষণা পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালে রিইব কাজ করছে “প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞানভিত্তিক কৃষি প্রতিবেশ: শিক্ষণ ও গণগবেষণা” বিষয়ে। যার বিষয়বস্তু কৃষি-প্রতিবেশ, বিকল্প কৃষি, জৈব কৃষি ইত্যাদি এবং এসম্পর্কিত জ্ঞানের অন্বেষণ ও কৃষক সমাজে এর চর্চা করা। আরএলএসের পার্টনার দিল্লীতে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান ‘ফোকাস অন দ্যা গ্লোবাল সাউথ, ইন্ডিয়া’ একই বিষয়ে কাজ করছে। রিইব মূলত একশন রিসার্চ এবং ফোকাস প্রধানত প্রকাশনার প্রতি জোর দিয়ে কাজ করে থাকে।

কৃষি-প্রতিবেশ নিয়ে বাংলাদেশে খুব বেশি কাজ হচ্ছে একথা এখনও পর্যন্ত বলা যাবে না। কৃষি-প্রতিবেশ শব্দটিও এক অর্থে নতুন সকলের কাছে। সেক্ষেত্রে এই বিষয়টি বাংলাদেশের কৃষকসহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কাছে তুলে ধরাটা জরুরী। আরও জরুরী কৃষিক্ষেত্রে জেন্ডার সম্পর্ক বিশ্লেষণের। বাংলাদেশে নারী বিষয়ক গবেষণা হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে কিন্তু কৃষক নারী সম্পর্কে বিস্তৃত গবেষণা কম। কৃষির ক্ষেত্রে বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিবেশ একটা বড় দিক। প্রতিবেশের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক এবং কৃষি প্রতিবেশে জেন্ডার সম্পর্ক বোঝাটা তাই জরুরী।

কৃষি প্রতিবেশ বিষয়টি বাংলাদেশে আরও ছড়িয়ে দেবার জন্যে বাংলা ভাষায় এই বিষয়ে প্রকাশনা জরুরী। এই লক্ষ্যে আশ্লেষা খাডসে রচিত এবং ‘ফোকাস অন দ্যা গ্লোবাল সাউথ’ প্রকাশিত “উইমেন, এগ্রোইকোলজি এন্ড জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি” বইটির অনুবাদ ও সংযোজন করে বাংলাদেশে এই বইটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই উদ্যোগে নয়া দিল্লীর ফোকাস-এর সমন্বয়ক Mr. Afsar Jafri অনুমোদন প্রদান করায় আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে আমাদের সুহৃদ পার্টনার রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং (আরএলএস)-এর রেসিডেন্ট রিপ্রেজেনটেটিভ স্টেফান মেন্টশেল এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার বিনোদ কষ্টি-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য।

রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি, নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা এবং প্রকল্পের কর্মীসহ রিইব-এর সহকর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বইটি প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য। বইটিকে ছবি দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন প্রকল্পের গবেষণা সহকারীদ্বয় সাতক্ষীরা জেলার চৈতন্য কুমার দাস এবং বগুড়া জেলার আনোয়ার হোসেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রতি তাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য।

পরিশেষে বইটি কৃষক নারীদের জীবনমানের উন্নয়নে ও জ্ঞান অন্বেষণে কাজ করবে বলে আমি আশাবাদী।

সুরাইয়া বেগম
প্রকল্প সমন্বয়ক, রিইব

সূচিপত্র

ভূমিকা ৫

কৃষি-প্রতিবেশ ৬

জেন্ডার সম্পর্কিত কিছু মৌলিক ধারণা ৯

১. জেন্ডার কি ৯

২. জেন্ডার এবং ক্ষমতা ১১

৩. পিতৃতান্ত্রিকতা কি? ১২

৪. জেন্ডার ভূমিকা কি? ১৫

৫. কৃষিতে জেন্ডার ভূমিকা ১৬

কিভাবে বর্তমানে প্রচলিত কৃষি/পুঁজিবাদী হস্তক্ষেপ জেন্ডার সম্পর্ক পরিবর্তনে এবং নারীকে অধিকারচ্যুতকরণে কাজ করে থাকে ১৭

কৃষিতে নারী ১৮

১. বাংলাদেশের কৃষিতে নারীর মর্যাদা ১৯

কৃষি-প্রতিবেশ ঃ কাঠামো বনাম রূপান্তর ২২

কৃষি-প্রতিবেশ কি জেন্ডার সমতা তৈরি করতে পারে? ২৫

জেন্ডার উপযোগী স্পেস তৈরি করা ২৬

জেন্ডার বৈষম্য নিয়ে সম্মিলিত কার্যক্রমে যাওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি ২৮

গৃহের পরিসরে কৃষি-প্রতিবেশের প্রভাব ৩০

কিভাবে কৃষি-প্রতিবেশ নারীর জন্যে অনেক বেশি সুযোগ তৈরি করে? ৩১

কেস স্টাডি

১. তামিলনাড়ু উইমেন'স কালেক্টিভ ৩৩

২. নয়া কৃষি আন্দোলন ৩৫

৩. পঞ্চগড়ের নারী কৃষকদের আত্ম-উন্নয়নে গণগবেষণা ৩৬

৪. নারী-পুরুষ মজুরী বৈষম্য হ্রাসে মুন্ডা নারী গণগবেষকদের সাফল্য ৩৭

তথ্যসূত্র ৩৮

ফটো: চৈতন্য কুমার দাস

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে এগ্রোইকোলজি বা কৃষি-প্রতিবেশ মানুষের চিন্তার জগতে ঠাঁই নিয়েছে অনুমিত হয়। মানুষ এখন নিজের এবং চারপাশের পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক হচ্ছে। বিশ্বে এমনকি প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতেও কৃষি প্রতিবেশ নিয়ে সামাজিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছে। বাংলাদেশেও কৃষি-প্রতিবেশ বিষয়টি ক্রমশ: আমাদের জ্ঞানের জগতে বিস্তার লাভ করছে। কৃষিকাজ ও ভূমি ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে, জীব জগতের (মানুষ, অন্যান্য প্রাণী ও গাছপালা) সাথে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের (যেমন: মাটি, পানি, বায়ু, নদী, পাহাড়, গাছপালা, পশুপাখী প্রভৃতি) যে পারস্পরিক সম্পর্ক সেটা নিয়ে অধ্যয়নই হচ্ছে কৃষি-প্রতিবেশ।[১]

'এগ্রোইকোলজি' শব্দটির অনুবাদ এখানে করা হয়েছে কৃষি-প্রতিবেশ। প্রতিবেশ শব্দটি মূলত: প্রাণবৈচিত্র্য বা জীববৈচিত্র্য শব্দকে জড়িয়ে আছে। 'বায়োডাইভার্সিটি' শব্দটিও এখন বহুল প্রচলিত শব্দ, যার অর্থ এই জীবজগতের বহুবৈচিত্র্য ও বিপুল ভিন্নতা নিয়ে বিরাজমান প্রাণবৈচিত্র্য। "জৈব এবং অজৈব প্রকৃতি নিয়ে সৃষ্ট এই ধরিত্রী। আমাদের চারপাশের জৈব প্রকৃতির মধ্যে আছে উদ্ভিদ জগত ও প্রাণী বা জীবজগত, যেখানে আছে মনুষ্য প্রজাতিও। এছাড়াও আছে পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, জীবাণু এবং অণুজীবদের বিশাল অদৃশ্যমান জগত। অন্যদিকে প্রতিবেশ শব্দটির বলয়ের ব্যাপকতা রয়েছে। যে প্রাণবৈচিত্র্য এই পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে তাদের মধ্যে জীবের মধ্যেকার বৈচিত্র্যই শুধু নয়; উদ্ভিদ, পোকা ও জীবাণুর নানান প্রজাতি যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে তাদের স্বাভাবিক আবাস বা প্রাকৃতিক আবাস গড়ে তোলে, তাই হচ্ছে প্রতিবেশ। এই আবাস জড় ও প্রাণের সমন্বয়ে গঠিত। এই আবাস শুধু জৈব কিংবা সপ্রাণ উপাদানে তৈরি নয়, যে মাধ্যমের মধ্যে

সজীব সত্ত্বা নিজের আবাস গড়ে তোলে সেটা অজৈব পদার্থও হতে পারে, যেমন মাটি ও পানি। উদ্ভিদ, পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, জীবাণু এবং অণুজীবদের নানান প্রজাতির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সাধারণভাবে জড় ও জীবের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার মাধ্যমে যে অবস্থা বিরাজমান তা হচ্ছে ইকোলজি বা প্রতিবেশ"।[২]

বর্তমান বিশ্বে কৃষি-প্রতিবেশ ক্রমশ: বিভিন্ন দেশে সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে। এতে দেখা যায় যে, আমাদের ধরিত্রীতে এবং মানব জীবনে যেসব বহুমূখী সংকটের আমরা মুখোমুখী হচ্ছি যেমন, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন, পানির সংকট, পরিবেশ দূষণ এবং বেকারত্ব - এসব সমস্যা সমাধানে কৃষি-প্রতিবেশ-এর রয়েছে প্রকৃত সম্ভাবনা। এটি একটি সঠিক তৃণমূল সমাধান। এটি বিশ্বের অধিকাংশ সম্পদহীন জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা এবং সামর্থ্যকে বৃদ্ধি করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই সামাজিক আন্দোলন কি নিশ্চিত করে যে এতে নারী-পুরুষ সমানভাবে উপকৃত হতে পারে? সামাজিক অসমতাকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে এর মধ্যে কি সম্ভাবনা আছে? এটা কি নিশ্চিত করে যে, নারীরা ঘরে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং সমাজে নেত্রী হতে পারবে পুরুষের মতন? যদি উত্তর হ্যা হয় কিভাবে তা হতে পারে? কৃষি-প্রতিবেশ কিভাবে এসব বিষয়কে দেখে থাকে? এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করাই হচ্ছে এই বইয়ের লক্ষ্য। পরিবেশ নারীবাদীরা এই বিষয়টিকে আরও গভীরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কৃষি-প্রতিবেশ ভাবনার পরিসরে যা গুরুত্বপূর্ণ।

এ বিষয়ে আরও আলোচনার আগে জেন্ডার কি, কৃষি প্রতিবেশ বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা লাভ বিষয়কে অনুধাবন করতে সহায়ক হবে।

কৃষি-প্রতিবেশ

কৃষি-প্রতিবেশ এমন কতগুলো চর্চা বা কাজের সমষ্টি যা কৃষিকাজকে স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই ও মজবুত করে। এর লক্ষ্য হল পুষ্টিসমৃদ্ধ ও রাসায়নিকমুক্ত ফসল ফলানো। এ ধরনের কৃষিকাজ ইকোসিষ্টেমকে সুসংহত ও পুনরুদ্ধার করে এবং বাইরের উপাদান যেমন ঃ রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেয়। বাইরের এসব উপাদান তৈরিতে অনেক শক্তি খরচ হয়, খনিজ সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার হয় এবং ক্ষতিকর গ্যাস বাতাসে ছড়ায়। এছাড়া এসব উপাদান মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর। অন্যদিকে কৃষি-প্রতিবেশ হল কৃষিখামারের নিজস্ব সম্পদ এবং স্থানীয়ভাবে পাওয়া গাছ, পাখি, প্রাণী, পোকা এবং অণুজীব এর যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহার করা, যেখানে এসবের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্পর্ক বজায় থাকে। এই চাষ পদ্ধতি মাটির উপরের ও নীচের ভূমি ও পরিবেশ উভয়ই রক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়। অতিরিক্ত বালাই, কৃষিপণ্যের উচ্চমূল্য, শস্যহানি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে কৃষি-প্রতিবেশ নির্ভর চাষাবাদ ভূমি, মাটি রক্ষা করে ও ফসল উৎপাদনে সহায়ক এবং বছরের পর বছর তা অব্যাহত থাকে। কৃষি-প্রতিবেশ খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত মানুষের অধিকারকে প্রাধান্য দেয় যা বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যক।

কৃষি-প্রতিবেশ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দীর্ঘসময় ধরে প্রান্তিক চাষীদের বিভিন্ন উপায়ে আয় করার জন্য সমাধান দেয়। এগ্রোইকোলজি শুধু পরিবেশকেই ভাল রাখে না, সাথে সাথে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য আনয়নে

অবদান রাখে। প্রান্তিক কৃষকদের জন্যে কৃষি-প্রতিবেশ কিছু সুবিধা সৃষ্টি করে।[৩] এখানে সংক্ষেপে তা বর্ণনা করা হলো।

ক. উৎপাদন বৃদ্ধি ও জাতের বৈচিত্র্য : মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, জলবায়ুগত পরিবর্তনে খাপ খাওয়া, স্থানীয় ও দেশীয় প্রযুক্তিচর্চা এবং বহুশস্য চাষের জন্য কৃষকরা কৃষি-প্রতিবেশ নির্ভর চাষ করে থাকেন। স্বল্প সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকরা প্রতি একক উৎপাদনের উপর আয় করেন, সর্বোপরি কৃষকের মোট আয় বেড়ে যায়। এই চর্চা ফলনের নিশ্চয়তা দেয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে। উদাহরণস্বরূপ, আফ্রিকার ক্ষুদ্রচাষীরা জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির মাধ্যমে ৩ থেকে ১০ বছরের মধ্যে দ্বিগুণেরও বেশী ফসল ফলাতে সক্ষম হয়েছে।[৪]

খ. খাদ্য নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ : কৃষি-প্রতিবেশ চর্চায় দৈনন্দিন পারিবারিক খাদ্য চাহিদা পূরণ করা ছাড়াও পরবর্তী মৌসুমের জন্য খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। কৃষক খাদ্য ফলায় তার পরিবারের চাহিদা পূরণের জন্য এবং সে নিজের খাদ্যের জন্য বাজারের উপর কম নির্ভর করে। যে কৃষক জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করে তার খাদ্য নিরাপত্তা, শস্য বৈচিত্র্যতা ও খাদ্য বৈচিত্র্যতার নিশ্চয়তা অধিকতর দেখাতে পারে তাদের থেকে, যারা প্রচলিত কৃষক। এছাড়াও এই চর্চাটি রাসায়নিক সার মুক্ত বিধায় উৎপাদিত খাদ্য স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর। ফসল সংগ্রহ থেকে রেখে দেয়া বীজ কৃষক পুনরায় চাষ করতে পারে এতে বীজের জন্য বাজারের উপর নির্ভরশীলতা কমে। যেহেতু সংগৃহিত বীজগুলো নিজেরাই নির্বাচন ও বাছাই করে তাই বাজারের বীজের চেয়ে এ বীজের গুণাগুণ অনেক বেশী থাকে। এ বীজগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে যেহেতু এগুলো স্থানীয় আবহাওয়ায় প্রকৃতিগতভাবে উৎপাদিত।

ফটো : আনোয়ার হোসেন

গ. বাজার নির্ভরহীন, ঋণের চাপ কমায় : কৃষি-প্রতিবেশ চর্চা প্রান্তিক কৃষকদের আয় সার্থকভাবে বৃদ্ধি করে। বিদ্যমান রাসায়নিক কৃষি সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য ধারণ ও বহন করে এবং বাইরের যোগানের উপর প্রায় পুরোপুরি নির্ভর করে। এ চাষে প্রতিটি সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার হয়। যেমন ঃ মূলধন, ভূমি, পানি, রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক। কৃষক এ খরচ মিটাতে ঋণ গ্রহণ করে। অন্যদিকে, কৃষি-প্রতিবেশ চাষ পদ্ধতিতে বাইরের কোন ইনপুটের দরকার হয়না। উদ্ভাবনী সেচ প্রথার ব্যবহার করে এবং খামারের সম্পদ থেকে নিজেই জৈব সার (বায়ো-ইনপুট) তৈরি করে ব্যবহার করে বা অনেকক্ষেত্রে তার প্রয়োজন নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে অনেক সময় কোন মূলধন বিনিয়োগ ছাড়াই চাষ করা যায়। এমনকি যদি ফসল নষ্টও হয়ে যায়, তবুও কৃষকের ফসল চাষের জন্য কোন ঋণের বোঝা তার মাথার উপর থাকবে না, কারণ বাইরে থেকে তার কোন বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়নি। যে কোন পরিমাণ ফসল উৎপাদন হোক না কেন, কৃষক তা দ্বারা বেশি আয় ও সঞ্চয় করতে পারবে।

ঘ. আয়ের সুযোগ তৈরি : কৃষি-প্রতিবেশ চর্চায় জৈব সারের জন্য পশুপালন করা হয় এবং প্রকৃতিগতভাবে উৎপাদিত সার ব্যবহার করা হয় যা সরাসরি ক্ষেত থেকে পাওয়া যায় বা বসতবাড়ির আবর্জনা থেকে তৈরি হয়। এটা সরাসরি খামারের বিনিয়োগ কমায়। কৃষক তার গচ্ছিত টাকা দিয়ে অধিক সংখ্যক পশুপাখি বা জমি ক্রয় করতে পারে বা খামারের সেচ ব্যবস্থা উন্নত করতে পারে। গরু বা গাভী এবং মুরগী পালন করে কৃষক বাড়তি আয়ের সুযোগ পায়।

ঙ. খাদ্য সার্বভৌমত্ব : খাদ্য সার্বভৌমত্ব মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করে, তারা কি খাবে এবং কি চাষ করবে এবং যা হবে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে উৎপাদিত ও সকলের জন্য সহজলভ্য। স্থানীয় কৃষকের সর্বপ্রথমে স্থানীয় ও আঞ্চলিক খাদ্যে ও বাজারে প্রবেশ করার অধিকার থাকবে। তাদের উৎপাদিত ফসল বহুজাতিক কোম্পানি বা আমদানি করা পণ্যের চেয়ে বেশী অগ্রাধিকার পাবে। স্থানীয় বাজারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে স্থানীয় কৃষকদের কাছে। পণ্যের মূল্য কৃষকরা নির্ধারণ করবে, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া যাবে না। তাদের পছন্দ অনুসারে তারা কি খেতে চায় এবং কী চাষ করতে চায় এবং স্থানীয় খাবার নির্বাচনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কৃষক সম্প্রদায়েরই থাকবে। চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপন্ন খাদ্য সবাইকে খাওয়াতে পারবে, কিন্তু খাদ্য সার্বভৌমত্ব হচ্ছে খাদ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রান্তক কৃষকের সুস্বাস্থ্য, ন্যায় বিচার এবং সকলের জন্য সম্মান নিশ্চিত করা। এই পদ্ধতিতে কৃষি খামারের সামগ্রিক সম্পদ যেমন ঃ ভূমি, পানি, বীজ এবং আয়ের উপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

বাংলাদেশে কৃষি খাত বিভিন্ন ইস্যুতে যেমন, উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমানতা, অসহনীয় ইনপুট খরচ, প্রান্তিক কৃষকদের জন্যে স্বল্প ভর্তুকি, সরকারের যথাযথ ক্রয় ব্যবস্থাপনার অভাব এবং শস্য তোলার সময়ে নিম্নমূল্য ইত্যাদি সমস্যায় আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। এক্ষেত্রে কৃষি-প্রতিবেশ এই সমস্যা উত্তরণে সহায়ক হতে পারে। কারণ দেখা গেছে যে, এগ্রোইকোলজি বা কৃষি-প্রতিবেশ বিশ্বের লক্ষ লক্ষ প্রান্তিক কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাপনের উন্নতি ঘটাতে পারে, একই সঙ্গে তাদের খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে পারে।[৫]

ফটো: চৈতন্য কুমার দাস

জেন্ডার সম্পর্কিত কিছু মৌলিক ধারণা

১. জেন্ডার কি?

জেন্ডার শব্দটির আভিধানিক অর্থ সেক্স বা লিঙ্গ। কিন্তু উন্নয়ন অধ্যয়নে জেন্ডার এবং সেক্স-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। সেক্স হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে নারী ও পুরুষের শারিরীক ভিন্নতা, ফলে তা অপরিবর্তনীয়। জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে বেড়ে ওঠা নারী পুরুষের পরিচয় এবং নারী পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্ক। সমাজ নারী ও পুরুষের ভূমিকা নির্ধারণ করে দেয় এবং এই ভূমিকা পরিবর্তনশীল। জেন্ডার সমাজ কর্তৃক নির্মিত এবং নারী ও পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বোধ। তাই 'পুরুষ' ও 'নারী, হচ্ছে জৈবিক ব্যাপার, কিন্তু পুরুষত্ব বা নারীত্ব সাংস্কৃতিকভাবে গঠিত পরিচয়। যদিও লিঙ্গ ও জেন্ডারের ধারণাকে সহজেই মিলিয়ে ফেলা হয়, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য সামাজিক, জৈবিক নয়।[৬] নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করা হলে, প্রকৃতপক্ষে জেন্ডার সামাজিকভাবে গঠিত ধারণা, সহজাতভাবে নয়। জেন্ডার হচ্ছে অনেকগুলো সামাজিক প্রত্যাশা যা সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় এবং ছড়িয়ে পড়ে। আমরা যা শিখি তার সবই কোন বিশেষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে উৎপন্ন সামাজিক ধারণা।[৭]

জেন্ডার সম্পর্ক বিষয়ে বেশিরভাগ তাত্ত্বিকচর্চা অগ্রসর হয়েছে উন্নত বিশ্বে নারী বিষয়ক ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক চর্চার ভিত্তিতে, বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।[৮] তাদের মতে নারীর অবদমন শুধু যে উৎপাদনশীলতায় নিহিত তা নয়, বরং পুনঃউৎপাদনেও এর শিকড় রয়েছে। শুধু যে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এই বৈষম্য রয়েছে তাই নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোতেও তার স্বরূপ আছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর মর্যাদার অবনমনকে দেখতে হবে 'শ্রেণীসম্পর্ক ও জেন্ডারসম্পর্ক'-এর পটভূমিতে।[৯]

প্রায়শঃ একটা ভুল ধারণা দেখা যায় যে, জেন্ডার অর্থ নারী বা জেন্ডার ইস্যু অর্থ নারীদের ইস্যু । এটা সত্য যে, জেন্ডার ভিত্তিক কর্মসূচিগুলো বিশেষভাবে নারীদেরকে ফোকাস করে করা হয়, কারণ সমাজে মনে করা হয় নারীরা কম ক্ষমতাবান । তারা ব্যাপক অসমতার সম্মুখীন এবং তারা কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত বৈষম্যের শিকার । অবশ্যই সব নারীরাই এই পর্যায়ে নয়, তবে বাংলাদেশের কৃষি পরিবার এবং সমাজ যেখানে শ্রেণি, বর্ণ, জাত এবং ধর্ম ভীষণভাবে প্রভাবিত করে সেখানে এই অসমতার হার বেশি ।

জেন্ডার শব্দটি নারী, পুরুষ এবং তৃতীয় লিঙ্গ সমভাবে সকলকেই বোঝায় । জেন্ডার জৈবিক লিঙ্গের সমার্থক নয় । জৈবিকভাবে সকলেই কোন না কোন লিঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু জেন্ডার হচ্ছে সামাজিক গঠন । জন্মলাভ করার পর নারী এবং পুরুষ ক্যাটাগরি বিভাজনের পর তার পরিচয় নির্ধারিত হয় সে কি পরিধান করবে, তার আচরণ কেমন হবে, পরিবারে এবং সমাজে তার ভূমিকা কি রকম হবে এবং তার ক্ষমতা কতটুকু থাকবে তার উপর । জেন্ডার হচ্ছে শুধুমাত্র জৈবিক লিঙ্গ নয়, এটা অনেকাংশে সামাজিক অবস্থান, ক্ষমতার সম্পর্ক, অন্য অর্থে সমতা এবং অসমতা । উদাহরণস্বরূপ কেউ একজন ছেলে হিসাবে জন্ম নিল হয়ত, কিন্তু সে পুরুষ নয়, তার পোশাক পুরুষের নয় বা সে সেরকম আচরণ করে না যা পুরুষেরা করে থাকে বা পুরুষ হতেও হয়ত সে চায় না । কিন্তু সমাজ সেখানে বলে দেয় যে, ছেলের আচরণ হবে ছেলের মত এবং মেয়ের আচরণ মেয়ের মত । তারা বিশ্বাস করে যে, এরকম আচরণই 'স্বাভাবিক' । কিন্তু আমরা দেখি যে, এটা স্বাভাবিক নয়, এটা মানুষ শেখে বিভিন্ন অভ্যাসের মাধ্যমে ।

আমরা যখন বয়ঃসন্ধিকালে পৌছাই তখন এসব শেখানো হয় এবং বলে দেওয়া হয় সামাজিকীকরণের মাধ্যমে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মেয়েদেরকে বলা হয় কি তারা করতে পারবে, কি পারবে না, তারা কিভাবে পোশাক পরিধান করবে, কিভাবে কথা বলবে, তারা খেলবে পুতুল এবং হাঁড়ি পাতিল নিয়ে, তাদেরকে অনুগত হতে হবে এবং ঘরের কাজ শিখতে হবে । অন্যদিকে ছেলেদেরকে বলা হয়, তারা প্রকাশ্যে কাঁদতে পারবে না, তাদেরকে পৌরুষদীপ্ত হতে হবে, ভাবাবেগবর্জিত এবং আগ্রাসী হতে হবে, গৃহস্থালী কাজকর্ম তাদের করা উচিৎ নয়, বরং তারা হবে খেলোয়াড়সুলভ, পুতুলের মত নয় ইত্যাদি । মানুষ জেন্ডার উপযোগী আচরণ এবং ব্যবহার শেখে তরুণ বয়স থেকে । পরিবার, ধর্ম, মিডিয়া এবং অন্যান্য সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, এমনকি স্কুল-কলেজ থেকেও শেখে । যখন মানুষ এইসব বিধি বিধানে খাপ খায় না, তখন তা মানসিক, শারীরিক চাপ তৈরি করাসহ অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টি করে । যেসব মানুষকে লিঙ্গ দ্বারা চিহ্নিত করা যায় না, যারা কিনা কোন কারণে সমাজে কাঙ্ক্ষিত লিঙ্গীয় ভূমিকার বাইরে বসবাস করে তাদেরকে transgender বা হিজড়া বলে । যখন মানুষ ভিন্নপথে যায় বা প্রথাগত জেন্ডার বোধের বাইরে পা রাখার চেষ্টা করে, তখন সাধারণত রক্ষণশীল সমাজ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে । মানুষ প্রথাগত চালচলনের বাইরের কোন কিছুকে সাধারণতঃ স্বীকৃতি দিতে চায় না । পরিবারে কোন পুরুষ যখন মেয়েদের মত কাপড় পরে বা আচরণ করে, লোকজন তাকে হিজড়া বলে চিহ্নিত করে, তখন তাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করে এবং পরিবার তাদেরকে বর্জন করে । একইভাবে কোন মেয়ে যদি নিয়ম ভঙ্গ করে ছেলেদের কাজ করে, ছেলেদের পোশাক পরে, বাইরে থাকা অভ্যাস করে, ঘরের কাজ করতে অস্বীকার করে, তখন মানুষ ভুরু কুঁচকায় । কিন্তু এসব নেতিবাচক আচরণ হচ্ছে সামাজিক শর্তসমূহের ফল যা কিনা উদ্ভুত সমাজ সৃষ্ট ধারণা থেকে যে, কোনটা স্বাভাবিক কোনটা নয় । এ ধরনের মূল্যবোধ চ্যালেঞ্জ হওয়া উচিৎ এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হওয়া দরকার ।

আমাদের সমাজের কিছু প্রথা এবং ঐতিহ্যের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য অন্তরিত এবং এগুলো 'স্বাভাবিক' এবং 'প্রাকৃতিক' এই ধারণা সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ, ছেলে সন্তানের জন্মকে উদযাপন করা হয় কানের কাছে আযানধ্বনি শোনানোর মাধ্যমে, কিন্তু মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে নীরবতা পালন করা হয়, কখনো কখনো কন্যাসন্তান জন্মদানের জন্য মায়ের প্রতি দোষারোপ করা হয় যেন এটা অভিশাপ। এধরনের বৈষম্যমূলক ব্যবহার খুব স্বাভাবিকভাবে নেওয়া হয় এবং কদাচিৎ এটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়।[১০]

যদিও এটা খুব সাধারণ যে, মানুষ শুধুমাত্র নারী ও পুরুষ এই দুই লিঙ্গের অধিকারী নয়, কিছু মানুষ আছে যাদেরকে নারী বা পুরুষ এই দ্বৈত বিভাজনের দ্বারা কঠোরভাবে চিহ্নিত করা যায় না, যেমন হিজড়া জনগোষ্ঠী। যারা তৃতীয় লিঙ্গ এবং যারা কোন নারী বা পুরুষ হিসাবে ক্যাটাগরি ভুক্ত নয় এবং এরা আইনগতভাবে স্বীকৃত। ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করেছে যে, প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে তার নিজ লিঙ্গ পরিচয় গ্রহণ করার।[১১]

বাংলাদেশেও তৃতীয় লিঙ্গের এরা মূলতঃ হিজড়া নামে চিহ্নিত এবং ২০১৩ সালের ১১ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকার হিজড়াদেরকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।[১২] লিঙ্গের বিভিন্ন মাত্রা আছে এবং প্রতিটি মানুষ নারী ও পুরুষ এই দুইয়ের বাইরেও স্বপরিচয়ে পরিচিত হতে পারে।

প্রত্যেক মানুষের পরিচয়ের ক্ষেত্রে জেন্ডার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এটি অন্যান্য ক্যাটাগরি যেমন বর্ণ, ধর্ম, শ্রেণির ভিত্তিতে বিভাজন করা যায় না। আমাদেরকে এসবই সমষ্টিগতভাবে দেখতে হবে, সমাজে এদের প্রত্যেকের সমান অবদান আছে।

২. জেন্ডার এবং ক্ষমতা

সমাজ হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে স্তরায়িত ক্ষমতা সম্পর্কের সমষ্টি। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে শ্রেণি এবং বর্ণ হচ্ছে সাধারণভাবে প্রচলিত শুধুমাত্র দুই ধরনের স্তরায়িত ক্ষমতা সম্পর্ক। এই ক্ষমতা সম্পর্কে একজন অপরের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাবান এবং একে অপরের উপর ক্ষমতা চর্চা করে থাকে। জেন্ডার হচ্ছে সেরকমই একটা ক্যাটাগরি। জেন্ডার হচ্ছে বিশ্বে অদৃশ্যমান ক্ষমতার সবচেয়ে স্থায়ী একটি ফর্ম। জেন্ডার ক্ষমতাকে একটা কাঠামো দান করে এবং জেন্ডার সম্পর্ক হচ্ছে ক্ষমতার সম্পর্ক।[১৩] পুরুষ নারীর উপর ক্ষমতা চর্চা করে শুধুমাত্র গৃহের ব্যক্তিগত পরিমন্ডলে নয়, বরং বাইরের জগতের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াতেও তা করে থাকে। পুরুষ এবং কোন কোন নারী প্রায়শই মনে করে যে, নারীর ক্ষমতাহীনতা হচ্ছে স্বাভাবিক এবং যথোপযুক্ত। এটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর প্রবেশাধিকারকে হ্রাস করে এবং কার্যকরী অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর আত্মবিশ্বাসকে প্রতিহত করে। সেই সাথে পাবলিক মিটিং-এ নারীকে কথা বলতে বাধা দিয়ে থাকে।

ক্ষমতা অর্থ সর্বময় ক্ষমতা, যা কিনা একজনকে এমন ক্ষমতা দেয় যা দ্বারা সে যদি চায় তাহলে কর্তৃত্ব, প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ – এই তিনের ব্যবহারের মাধ্যমে সে যা কিছু করতে পারে। কিন্তু অনেকে একে চ্যালেঞ্জ করে যে, 'ক্ষমতা'র একটা বিকল্প আইডিয়া আছে, ক্ষমতা অনেক কিছুই করতে পারে, যেমন কি না শেষ পর্যন্ত অর্জনের

সামর্থ্য অথবা একটা সমষ্টিগত কার্যক্রম বা সমষ্টিগত এজেন্সী যেখানে ক্ষমতা অন্তরিত। ভিন্নভাবে যার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়, যা হচ্ছে - আত্মবিশ্বাস, আত্মাভিমান বা আত্মমর্যাদা।

ক্ষমতাকে ভিন্নভাবে দেখা কেন গুরুত্বপূর্ণ? এটা গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, ক্ষমতাকে দেখার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী এটাই তুলে ধরে যে, ক্ষমতা সবসময় ক্ষমতাবানদের সাথেই থাকে না, এটা সব সময় নেতিবাচক এবং নির্যাতনমূলক নয়। এটা পজিটিভ বা সদর্থক হতে পারে এবং এই ধরনের পজিটিভ ক্ষমতা, সে অর্থে ক্ষমতাহীনদের দ্বারা চর্চিত হতে পারে। Lukes যেমন বলেছেন যে, "যেভাবে আমরা ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা করি তা হয়ত ক্ষমতা কাঠামো এবং ক্ষমতা সম্পর্ককে পুনরুৎপাদন এবং শক্তিশালী করে অথবা বিকল্পভাবে এটা হয়ত সেসবকে চ্যালেঞ্জ বা ধ্বংস করে"।[১৪] ক্ষমতা সম্পর্কে এ ধরনের বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী গুরুত্বপূর্ণ তাদের জন্যে যারা সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। যার সঙ্গে যুক্ত সামাজিক আন্দোলন, যা আমাদেরকে দেখায় যে, এই ধরনের ক্ষমতা পরিবর্তনের শক্তি হিসাবে ব্যবহার হতে পারে বা মানুষকে জাগিয়ে তুলতে পারে।

৩. পিতৃতান্ত্রিকতা কি?

আক্ষরিক অর্থে পিতৃতন্ত্র হচ্ছে পিতার শাসন। এটা একটা সামাজিক প্রথা যেখানে নারী পুরুষের অধস্তন, নিয়ন্ত্রিত, বৈষম্যের অধীন এবং তার ক্ষমতা, সেক্সুয়ালিটি, চলাচল, সম্পত্তি ও অন্যান্য সম্পদের মালিকানা এবং অভিগম্যতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় তার অপ্রধান বা দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদা।[১৫]

পিতৃতন্ত্র বিশ্বের সকল সমাজে বিভিন্ন লেভেল এবং ফর্মে পরিব্যাপ্ত। এই ব্যবস্থায় পুরুষরা ক্ষমতা ধারণ করে এবং চর্চা করে এবং ঘরে বাইরে উভয় ক্ষেত্রে নারীর উপর আধিপত্য করে থাকে। পুরুষ অধিকার করে রাখে পাবলিক পজিশন, তারা পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায় এবং গৃহের ও সামাজিক ক্ষেত্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রণয়ন করে। পিতৃতন্ত্রে নিহিত ক্ষমতার স্তরায়ন বা হায়ারার্কি। শুধুমাত্র পুরুষরা নারীকেই নিয়ন্ত্রণ করে তা নয়, বরং বয়স্ক পুরুষরা কমবয়সী পুরুষদের উপরও আধিপত্য করে থাকে। পুরুষ এবং নারী উভয়ই পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং প্রথা বজায় রাখতে ভূমিকা পালন করে।

এর অর্থ এই নয় যে, নারীদের কোন ক্ষমতা নেই, নারীরাও ক্ষমতা চর্চা করে থাকে, পিতৃতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী যতটুকু ক্ষমতা চর্চা করতে অনুমোদন দেয়া হয় ততটুকু। একটা ছাঁচে ফেলা প্রচলিত উদাহরণ হচ্ছে, শ্বাশুড়ী -বউ সম্পর্ক, যেখানে শ্বাশুড়ী - যে কিনা তার ছেলের বউ-এর উপর আধিপত্য দেখিয়ে থাকে। সাধারণতঃ মানুষ ভাবে যে, পিতৃতন্ত্রের বিপরীতার্থক ধারণা হচ্ছে মাতৃতন্ত্র। ভাষাগত অর্থে এটি হয়ত সঠিক কিন্তু যখন ক্ষমতার প্রেক্ষিত থেকে দেখা হয় তখন এটা গ্রহণীয় নয়, কারণ মাতৃতন্ত্রও পিতৃতন্ত্রের মতই একটি বিশেষ লিঙ্গের ক্ষমতা কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ব্যাপ্ত।[১৬]

সত্যিকার অর্থে পিতৃতন্ত্রের বদলে ভিন্ন ব্যবস্থা কখনই মাতৃতন্ত্র নয়। বরং কাম্য হচ্ছে লিঙ্গ সমতা বা জেন্ডার সমতা, যেখানে লিঙ্গের ভিত্তিতে অন্যের প্রতি নিয়ন্ত্রণ বা বৈষম্য নেই।

সাধারণ ধারণা যে, পুরুষেরা নিয়ন্ত্রণ করবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান; এটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। ধর্মীয় বিধানসমূহ যেমন ইসলাম, বেদ ও হিন্দুত্ববাদ এবং অন্যান্য ধর্মে নারীর উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ চর্চা করা হয়।

বৈদিক যুগে (খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০-৮০০) হিন্দু সংস্কৃতিতে দেখা গেছে নারীরা পবিত্র হিসাবে 'সম্মানিত'।[১৭] এর অর্থ হচ্ছে একজন নারী যে নিজে ছিল ক্ষমতা ও সতীত্বের প্রতিভূ। একজন নারীকে পুজা করা হতো শুদ্ধতা এবং সতীত্বের আলোক বর্তিকা হিসাবে। এই সময়ই দেখা গেছে প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবাহ সংস্থাপিত হতে যা কিনা নারীকে গৃহের পরিমন্ডলে থাকতে এবং ছেলে সন্তান জন্মদান করতে বাধ্য করেছে।

বৈদিক যুগ পরবর্তী সময়ে, প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ বছর থেকে ১৮৫ খ্রীস্টাব্দ সময়ে, নারীর এই দ্বৈত ভূমিকা (পবিত্র এবং অনুগত) পুনরায় দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়েছিল। নারীরা নিয়ন্ত্রণের বিষয় এবং পুজনীয় হিসাবে সম্মানীয়রূপে আবির্ভুত হয়েছিল। তাদেরকে দেবী হিসেবে ভক্তি করা হতো কিন্তু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে তাদের অনুমতি ছিল না, যা নিয়ন্ত্রিত ছিল পুরুষদের দ্বারা। নারীরা তাদের স্বামী এবং পরিবারের মর্যাদার মাধ্যমে পরিচিত হতো এবং এই মর্যাদার সাথে সংযুক্ত থাকতে বাধ্য হতো। 'সতী' ব্যবস্থার মত চর্চা পুনরায় নারীকে দাসসুলভ এবং স্বামীর প্রতি নিবেদিত ভূমিকাকে বদ্ধমূল করে যে, স্বামী ব্যতীত তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

খ্রীস্টান বাইবেল-এও একই ধরনের নারীর অধস্তনতার কথা উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়, যেখানে আদম এবং ঈভ-এর মিথ সম্পর্কে বিভিন্ন টেকস্ট-এ বলা হয়েছে যে, ঈভ সৃষ্টি হয়েছিল আদম এর পাঁজরের হাড় থেকে এবং তাকে আদমের অধস্তন হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। বেশিরভাগ ধর্মেই নারীর উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণে নারীর আচরণ এবং মূল্যবোধ এর নির্দেশনা দান করা হয়েছে।

পিতৃতন্ত্র হচ্ছে পুরুষ আধিপত্যের একটি রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থা। যা প্রভাব রেখেছে ব্যক্তি এবং সামষ্টিক জীবনের বহুধরনের সমস্যার বিভিন্ন দিকে। এটা হচ্ছে পুরুষ এবং নারীর মধ্যেকার ক্ষমতার সম্পর্ক। নারীর অবদমন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে সমাজে ক্রমোচ্চবিন্যাসে বা হায়ারার্কিকাল কন্ডিশনে যা প্রয়োগ হয়েছে শ্রেণি এবং জাতপাতের চিহ্নিত হওয়ার সাথে।

ফটো: চৈতন্য কুমার দাস

আমরা এই ধারণার প্রয়োগ দেখতে পাই মূল্যবোধ, বিভিন্ন প্রথা, প্রত্যাশা এবং সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। এখানে পিতৃতন্ত্রের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে।[১৮]

ক. **নারীর অবমূল্যায়ন ঃ** নারীদের কাঁধে আছে দ্বৈত কাজের বোঝা; তারা ঘন্টার পর ঘন্টা বেতনহীন গৃহকর্ম করে থাকে, আবার অনেকে আছে অন্যের বাসাবাড়ির কাজ করে থাকে নিজ পরিবারের জন্যে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের নিমিত্তে। গৃহকর্মে নারীর কাজ মনে করা হয় যে মেয়েলি কাজ, যা পুরুষের কাজের সমান মর্যাদা লাভ করে না। এখানে ক্রমোচ্চবিন্যাস ধারণার বিষয়টা স্পষ্ট, যেখানে গৃহকর্মের কাজ হচ্ছে নিম্ন পর্যায়ের এবং পুরুষের কাজের তুলনায় কম মূল্যের। নারীদের গৃহকর্মের কাজ প্রত্যাশিত এবং সবসময়ই এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, ঘর সংসারের কাজ নারীরাই করবে। যদি নারীর দ্বৈত কাজের বোঝা হিসাব করা হতো তাহলে দেখা যেত যে, নারীরা অতিরিক্ত কাজ করে থাকে।

খ. **প্রথাগত পুরুষতান্ত্রিক গুণাবলীকে ধরে নেয়া হয় কেন্দ্রীয়, যেখানে অন্যান্য নারীসুলভ গুণাবলী স্বীকৃত অধস্তন হিসাবে ঃ** পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, পুরুষ সুলভ এবং নারীসুলভ হচ্ছে 'গুণাবলী' এবং এখানে হায়ারার্কি বা ক্রমোচ্চবিন্যাস অবস্থা বিরাজ করে যে একজন অন্যজনের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। তথাকথিত প্রথাগত পৌরুষদীপ্ত গুণাবলীসমূহ যেমন, ক্ষমতা, যৌক্তিকতা, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিযোগিতার মনোভঙ্গী ইত্যাদি হচ্ছে পুরুষের গুণাবলী। নারীসুলভ গুণাবলীসমূহ যেমন, আবেগাক্রান্ত হওয়া, অভিব্যক্তির প্রকাশ, করুণাময়ী, সমবেদনা এবং প্রতিপালন করা ইত্যাদি নারীর উপর আরোপিত এবং এসবই অধস্তন গুণাবলী হিসাবে দেখা হয়।

গ. **স্বাভাবিক বাস্তবতা হিসাবে আধিপত্য তুলে ধরা হয় বা প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে ঃ** পিতৃতন্ত্রে অসমতা একটি প্রশ্নহীন প্রাকৃতিক বিষয় হিসাবে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এই ধরনের ডিসকোর্স খুব সহজেই নির্যাতিতের মধ্যে অন্তরিত হয়ে থাকে এবং তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, প্রাকৃতিক অভিপ্রায়ের কারণে তারা দুর্বল। এটা শুধুমাত্র পুরুষ নয় অনেক নারীও বিশ্বাস করে যে, নারী হচ্ছে পুরুষের অধস্তন এবং তারা অন্য নারীকেও এই চোখে দেখে থাকে। সামাজিক আন্দোলনের উপস্থিতি ভিন্ন এবং বিকল্প ডিসকোর্সের কথা তুলে ধরে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা করে।

ঘ. **অধিকারহীনতা ঃ** বর্তমানকালে নারীদের ভোটদানের অধিকার স্বীকৃত অধিকার এবং সহজেই এই অধিকার তারা বাস্তবায়ন করতে পারে, কিন্তু এই ভোটের ও অন্যান্য অধিকার অর্জনের জন্য বিশ্বে প্রায় শত বছরের বেশি সময় ধরে নারীদেরকে লড়াই করতে হয়েছে। বাংলাদেশে সৌভাগ্যক্রমে সংবিধান প্রণয়নের শুরুতেই ২৮ (২) ধারায় নারী পুরুষের সমানাধিকার এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯] নারীর প্রতি শোষণ, নির্যাতন, যৌতুক, এসিড ক্ষেপন প্রতিরোধে এবং বিভিন্ন অধিকার বাস্তবায়নে পরবর্তীতে আরও অনেক আইন হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ভিন্ন, কারণ সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থান নারীর যে বিভিন্ন অধিকার আছে সে বিষয়টিকে অনুধাবন করা তাদের জন্য অসম্ভব করে তোলে।

ঙ. **নারীর প্রতি সহিংসতা ঃ** সহিংসতা হচ্ছে পিতৃতন্ত্রের একটি বোধ। ঐতিহাসিকভাবে নারী-পুরুষের মধ্যেকার ক্ষমতা সম্পর্কের অসমতার ফল এটি এবং নারীরাই এই অসমতার সম্মুখীন হয়। সহিংসতা হতে পারে শারীরিক, যেমন গৃহাভ্যন্তরীণ নিপীড়ণ বা ধর্ষণ। কিন্তু সহিংসতা হতে পারে মনস্তাত্ত্বিকভাবেও যেমন, ব্ল্যাকমেইল, আবেগের নিপীড়ণ, গোপন ভীতি প্রদর্শন। এটি (সহিংসতা)

বিস্তৃত হতে পারে হিসাব নিকাশ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও যেমন, সম্পত্তির অধিকারে অস্বীকৃতি, ঋণে প্রবেশাধিকারের অভাব, একই কাজের অসম মজুরী বা মজুরীহীনতা। নারীর প্রতি সহিংসতা বর্তমানে এক বৈশ্বিক বাস্তবতা। এটি বিরাজমান সকল সমাজে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শ্রেণি এবং সংস্কৃতিতে। বর্তমান বাংলাদেশে যৌতুকের জন্য নারী নির্যাতন এবং নিগ্রহ, এসিড নিক্ষেপ, ইভটিজিং, পাথর নিক্ষেপ, পুড়িয়ে মারার ঘটনা অবাধে ঘটে থাকে এবং ঘরের ভেতর-বাইরে নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনাও সাধারণ।

ফটো: আনোয়ার হোসেন

৪. জেন্ডার ভূমিকা কি?

সমাজে নারী পুরুষের কি ধরনের আচরণ হওয়া উচিত তার প্রথাগত ধারণা থেকে 'জেন্ডার ভূমিকা' শব্দটির উৎপত্তি। এসবই শেখানো হয় সামাজিকতার মাধ্যমে। প্রত্যেক সমাজের কিছু নির্দিষ্ট নিয়মকানুন আছে যে, নারী ও পুরুষ কিভাবে আচরণ করবে। যদি কেউ নিয়মের ব্যতিক্রম অনুযায়ী আচরণ করে তবে সমাজের মাধ্যমে তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়।

বাংলাদেশে প্রথাগত জেন্ডার ভূমিকা হচ্ছে – নারীরা ঘরে থাকবে এবং সন্তানকে দেখাশোনা, লালনপালন করবে এবং পুরুষরা বাইরে কাজ করবে ও অর্থোপার্জন করে ঘরে নিয়ে আসবে। রক্ষণশীল পরিবারের কোন নারী যদি বাইরে কাজ করার চেষ্টা করে বা বাইরে রাত কাটায়, তাহলে তাকে পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। একইভাবে কোন পুরুষ যদি ঘরে থাকার চেষ্টা করে এবং সংসার ও সন্তান দেখাশোনা করে, রান্না এবং ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে অর্থোপার্জনের পরিবর্তে, তাহলে তাকে 'পৌরুষহীন', 'স্ত্রৈণ' বলা হয় এবং অন্যান্য কলঙ্কজনক কথার মুখোমুখি হতে হয়।

৫. কৃষিতে জেন্ডার ভূমিকা

প্রত্যেক সমাজে কৃষি ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনে নারী পুরুষে বিভাজন আছে। ঐতিহ্যগতভাবে কৃষিক্ষেত্রে নারীরা যেসব কাজ করে থাকে তার মধ্যে আছে- বীজ সংরক্ষণ, ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ, গৃহপালিত পশু-পাখির লালনপালন। অন্যদিকে পুরুষরা গরু দিয়ে হালচাষ করার মাধ্যমে ভূমিকা পালন করে থাকে। এই ধরনের শ্রম বিভাজন অঞ্চল ভেদে এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের কারণে ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন কিছু এলাকায় ছিল পুরুষরা শুধুমাত্র হালচাষ করত এবং ধরে নেওয়া হতো যে নারীরা ঘরে থাকবে এবং ঘরের অন্যান্য কাজ করবে। অন্য সংস্কৃতিতে নারীদের নিজস্ব কৃষি খামার ছিল এবং সবাই বাইরে কাজ করত। বর্তমানে এই প্রথার পরিবর্তন হয়েছে, ভূমিকারও পরিবর্তন হয়েছে, কৃষিতে নারীর ভূমিকা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু উন্নয়ন নীতিতে নারীর কাজ সাধারণভাবে অবমূল্যায়িত এবং কম গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে ধরা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, পুরুষদেরকেই শুধুমাত্র কৃষক হিসাবে স্বীকার করা হয়, কারণ তারা জমির মালিক, বিপরীতার্থে নারীদেরকে কিন্তু কৃষক বলা হয় না কেননা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের জমির মালিকানা থাকে না, যদিও তাদের কৃষিকাজের সাথে ব্যাপক সম্পৃক্ততা রয়েছে।[২০] কিছু কিছু কৃষি খামারভিত্তিক কাজে যেমন, প্রসেসিং বা প্রক্রিয়াজাতকরণে এবং সংরক্ষণে নারীরা ক্রমশ ব্যাপকহারে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এবং পুরুষ শ্রমিকরা সংখ্যাগতভাবে গুরুত্বহীন হয়ে যাচ্ছে।[২১]

অঞ্চল এবং কৃষ্টিভেদে কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ ভিন্ন হয়ে থাকে। বাংলাদেশে, এই পার্থক্য দেখা যায় আদিবাসী বা নৃ-গোষ্ঠীভিত্তিক নারী এবং মূলধারার নারীর মধ্যেকার কাজের ক্ষেত্রে। অনেক সময় ধারণা করা হয় যে, কৃষি শ্রমিক শ্রেণির নারীরা আসে নিম্নবর্ণ বা বিশেষ জাতপাত থেকে, বা নৃ-গোষ্ঠী থেকে। অন্যদিকে উচ্চবর্ণের এবং ধনী কৃষক শ্রেণির নারীরা মূলতঃ বাইরে বা মাঠে কাজ করতে যায় না। তবে তারা কৃষি সংক্রান্ত অন্যান্য কাজকর্ম যেমন পশুপালন, বীজ সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে কাজ করে থাকে।

ফটো: বাবুল চন্দ্র সূত্রধর

কিভাবে বর্তমানে প্রচলিত কৃষি/পুঁজিবাদী হস্তক্ষেপ জেন্ডার সম্পর্ক পরিবর্তনে এবং নারীকে অধিকারচ্যুতকরণে কাজ করে থাকে

জেন্ডার ও কৃষি পদ্ধতিতে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে ইষ্টার বজেরাপ[২২] উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। আধুনিকীকরণ নারীর অবস্থানকে উন্নত করবে - এই ধারণাকে তিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আফ্রিকার খোরাকী কৃষিতে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশের ফলে খোরাকী, জীবিকা নির্বাহী কৃষির প্রান্তিকীকরণ ঘটেছে, যেখানে নারীদের সম্পৃক্ততা এবং আধিপত্য ছিল। পুঁজিবাদী কৃষি শুধুমাত্র পুরুষ পরিচালিত খামার ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। যখন উপনিবেশকারীরা কৃষকদের আধুনিক যন্ত্রাদি এবং ক্যাশক্রপ বা বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল তাদের লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র পুরুষ কৃষকরা, যা উৎপাদন হ্রাস করেছিল। এছাড়াও উপনিবেশকারীরা যখন জমির ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথা শুরু করেছিল তখন প্রান্তিক নারীদের জমিগুলোও পুরুষদের নামে করা হয়েছিল। এমনকি উৎপাদক হিসাবেও নারীরা ছিল বেতনহীন শ্রমিক। Boserup পুজিবাদী উন্নয়নে নারীর অন্তর্ভুক্তির কথা তুলে ধরেছেন, যা কিনা পরবর্তীতে অনেক জেন্ডার কর্মী চ্যালেঞ্জ করেছেন। কিন্তু তার লেখনীতে নারীর ভূমিকা এবং প্রান্তিকীকরণের বর্ণনার অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে বিশ্বে প্রথাগত পদ্ধতির কৃষিতে নারীর ভূমিকার দিকে তাকালে দেখা যায় যে, বজেরাপের কাজের প্রায় চল্লিশ বছর পার হবার পরও তার খুব একটা পার্থক্য নেই। IFOAM যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে আমরা দেখি যে, প্রথাভিত্তিক চাষাবাদ হচ্ছে পুরুষের দুনিয়া এবং জেন্ডার পক্ষপাতিত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[২৩] সেখানে দেখা যাচ্ছে যে,

- প্রথাগত পদ্ধতির কৃষি খামারের মালিকানার ক্ষেত্রে মেশিনপত্র এবং বাহ্যিক ইনপুট যেমন কীটনাশক, সার এবং জেনেটিক্যালী মডিফায়েড বীজের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিনিয়োগের জন্য অনেক বেশি পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ নারীর জন্য বাধাস্বরূপ।
- রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের বোতল খোলার মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির সাথে সমঝোতা করা। কীটনাশকগুলো প্রকৃতপক্ষে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যকে ক্ষতি করে এবং এর কারণে ক্রমশঃ বাড়ছে অনাগত সন্তানের জন্ম ত্রুটি এবং গর্ভপাত এর সংখ্যা।
- ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং বীজের উপর স্থানীয় জনগণের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে যায় এবং পেটেন্টের মাধ্যমে কর্পোরেট গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি হয়ে থাকে। কোম্পানীগুলো বর্তমানে বীজের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অনেক বেশি লাভবান হচ্ছে। বৈশ্বিক বীজ বাজারের ৭৫% এর বেশি বীজের নিয়ন্ত্রণ আছে মাত্র দশটি কোম্পানীর হাতে।[২৪]
- পরিবেশগত অবনমন এবং স্থানচ্যুতির কারণে প্রায়শঃ অনুপাতবিহীনভাবে তা নারী ও শিশুদেরকে প্রভাবিত করে থাকে।
- বাজারমুখী একক শস্য চাষ করার বিশেষ লক্ষ্য খোরাকি উৎপাদন থেকে জমি এবং সম্পদকে দূরে রাখা, যা সাধারণত নারীদের দায়িত্ব ছিল।

ফটো: চৈতন্য কুমার দাস

কৃষিতে নারী

প্রাচীনকাল থেকেই কৃষি বাঙালির জীবিকার উৎস। উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের অবস্থাও প্রায় অভিন্ন। গোটা বাংলায় পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতসহ তিনটি প্রধান নদী পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং তাদের অসংখ্য শাখা প্রশাখা প্রসারিত পলিগঠিত সমভূমি হওয়ার দরুন প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে কৃষিকাজ করা সহজ ছিল এবং এখানে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ ছিল অত্যধিক। ব্রিটিশ আমলের গোড়ার দিকে শিল্পকর্ম, বিশেষত সুতিবস্ত্র উৎপাদন হ্রাসের ফলে এই চাপ আরও বৃদ্ধি পায়। বস্তুতঃ ১৯২১ সালের মধ্যে মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় চার পঞ্চমাংশ (৭৭.৩%) কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে, যা সমগ্র ভারতে ছিল ৬৯.৮%।[২৫]

শত শত বছর ধরে এখানকার মানুষ প্রায় ৮৫ ধরনের কাজে ১৩৬৪ প্রজাতির দেশী-বিদেশী উদ্ভিদ চাষ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করে আসছে। এদেশে প্রায় ১৭৫ প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদ জন্মে। প্রায় ৮-১০ হাজার বছর ধরে নারী-পুরুষসহ এ অঞ্চলের বাসিন্দারা বনজ, ফলদ এবং ভেষজ বিভিন্ন উদ্ভিদের উৎপাদন করছে। বিভিন্ন পেশাজীবি পরিবারে তৎকালীন অর্জিত ভেষজবিদ্যার চর্চা আজও টিকে আছে। বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে নারীদের সম্পৃক্ততা ছিল উল্লেখযোগ্য। কৃষি এবং নারী তাই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা গেছে যে, নারীরাই প্রথম কৃষি কাজের গোড়াপত্তন করেছিল। সময়ের বিবর্তনে গ্রামীণ নারীরা ক্রমশঃ কৃষিকাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছিল। বর্তমান সময়ে গ্রামীণ নারীদের কৃষির বিভিন্ন পরিসরে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দারিদ্র্যে নিপতিত গ্রামীণ পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং অনাবাদী মৌসুমে যোগান দেবার জন্যে খাদ্য সংরক্ষণে নারীরাই ভূমিকা রেখে থাকে। গৃহকর্ম ছাড়াও নারীরা কৃষিকাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে।

কৃষি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি এবং অধিকাংশের প্রধান পেশা। দেশের খাদ্যশস্যের চাহিদার অধিকাংশই সরবরাহ করে এদেশের কৃষক। বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ অনুসারে ১৫ বছরের বেশি বয়সী ও কর্মে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তির ৪৭.৩৩% নিয়োজিত আছে কৃষিখাতে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতে বাংলাদেশে শস্য উৎপাদনের বৃদ্ধির ফলে নারীদের কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে নার্সারীতে চারা উৎপাদন, সবজী চাষ, বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং শস্য তোলার পরবর্তী কাজে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭০% গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তাদের জীবিকার জন্যে কৃষির উপর নির্ভরশীল, তার মধ্যে ৪৫.৬% হচ্ছে নারী। Accelerating Agriculture Productivity Improvement in Bangladesh (AAPI) দেখাচ্ছে যে, ১৯৯৯-২০০৬ সালের মধ্যে কৃষি শ্রমশক্তিতে পুরুষের অংশগ্রহণ কমেছে ৭৬%, যেখানে নারী কৃষি শ্রমিকের হার ১০৩% বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭.৭ মিলিয়ন।[২৬] বাংলাদেশের নারীরা কৃষিতে অসাধারণ ভূমিকা পালন করছে।

১. বাংলাদেশের কৃষিতে নারীর মর্যাদা

ক. কৃষির নারীকরণ ঃ কৃষির সমস্যা গভীরতর হওয়া এবং কৃষি থেকে যখন আয় কমে যায় তখন অনেক পুরুষ অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে কৃষি ছেড়ে শহরে চলে যেতে শুরু করে তাদের পরিবারের ভরণপোষণের তাগিদে।[২৭] নারীরা তখন সংসারে থেকে যায় এবং কৃষিকাজ ক্রমবর্ধমানভাবে নারীর কাজে পরিণত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষিতে নারীর সম্পৃক্ততার হার ৫৯% যা কিনা পুরুষের চেয়ে বেশি এবং এই পার্থক্য ক্রমাগত বাড়ছে।[২৮] তবে এটি প্রমাণ করে না যে, এর ফলে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। এটা ঠিক যে, নারীরা বর্তমানে জমিজমার দেখভাল নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত চিত্র ভিন্ন, আগে পুরুষরা যেসব কাজ করতো, নারীদেরকে এখন সেই কাজের দায়িত্ব নিতে হয়েছে যেমন, জমি প্রস্তুতকরণ, শস্য চাষাবাদ, কীটনাশক ছিটানো, শস্য তোলা এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ। কিন্তু এসবই নারীকে করতে হয় কম মজুরীতে অথচ উৎপাদিত পণ্যের সম্পদে এবং এ সংক্রান্ত সেবাসমূহের প্রাপ্তিতে তাদের খুব কমই অধিকার আছে।

খ. গৃহের খাদ্য নিরাপত্তায় নারীর বিপুল অবদান এখনও ব্যাপকভাবে অদৃশ্যমান ঃ নারীর কাজ এখনও অনানুষ্ঠানিক, মজুরীহীন এবং ধরে নেওয়া হয় যে তা হচ্ছে গৃহকর্মেরই সংযোজন। উদাহরণস্বরূপ, পশুপালনে নারীর কাজ সাধারণতঃ বিবেচনা করা হয় যে, এটি তাদের গৃহস্থালীর ঘরের কাজ। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে নারীরা খাদ্য উৎপাদন ও চাষাবাদের কার্যক্রমে ব্যাপক অবদান রেখে থাকে। যেমন, জমি তৈরি করা, বীজ বাছাই, চারা তৈরি, বীজ বপন, জমিতে সার দেওয়া, আগাছা নিড়ান, ফসল মাড়াই করা, ধান ঝাড়া এবং শস্য তোলা ইত্যাদি। নারীর এসব কাজকে যথাযথ স্বীকৃতি দেয়া বা মূল্যায়ন করা হয় না এবং তা মজুরীবিহীন বা কম মজুরীসম্পন্ন। নারীরা পারিবারিক সম্পদ যোগান দেয় যেমন, জ্বালানী সংগ্রহ, পশুর খাদ্য এবং পানীয় জল সংগ্রহ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীদেরকে কৃষক হিসাবে বিবেচনা করা হয় না, তাদেরকে মনে করা হয় পুরুষ কৃষকদের এবং তাদের পরিবারের সহযোগী বা শ্রমিক। অথচ কৃষিতে নারীশ্রম পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি। বন্দনা শিবা তাই লিখেছেন - "ভারতীয় হিমালয় অঙ্গনে একবছরে ১ হেক্টর খামারে একজোড়া ষাঁড় কাজ করে

১,০৬৪ ঘন্টা, একজন পুরুষ ১,২১২ ঘন্টা এবং একজন নারী কাজ করে ৩,৪৮৫ ঘন্টা ।[২৯] বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে সমাজে নারীরা প্রধান জমির মালিক হিসাবে স্বীকৃত নয় এবং উৎপাদনশীল সম্পদে তাদের প্রবেশাধিকার সীমিত ।

গ. জমি এবং উৎপাদনমূলক সম্পদে নারীর প্রবেশাধিকারহীনতা ঃ কৃষিক্ষেত্রে বর্তমানে শ্রমিক হিসাবে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য । কিন্তু তাদের জমির উপর নিয়ন্ত্রণ সেভাবে নেই ।

বাংলাদেশে উত্তরাধিকার আইনের মাধ্যমে দেখা যায় যে, নারীরা সম্পত্তিতে পুরুষের সমান অধিকার লাভ করে না, সেখানে বৈষম্য বিদ্যমান । যদিও সিডও আইনে বাংলাদেশ সই করেছে কিন্তু নারীর সম্পত্তির সমান অধিকারের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ আছে । এই নিয়ে বাংলাদেশে নারী সংগঠনগুলো আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, মহিলা পরিষদ 'ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড" নিয়ে চেষ্টা করছে কিন্তু সফলতার আলো এখনও অনেক দূর ।[৩০] ভারতে দেখা যায় যে, ২০০৫ সালে সেখানে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে সংস্কার করা হয়, যেখানে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে । পাঁচটি রাজ্যে এই আঙ্গিকে রাজ্য আইন সংশোধন করা হয়েছে এবং অন্য কয়েকটি রাষ্ট্রেও তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলছে । ১২ বছর হয়ে গেছে আইন সংশোধনের কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এখনও নারীরা পুরুষের সমান সম্পত্তির অধিকারী হতে পারেনি । সামাজিক প্র্যাকটিসগুলোও ভূমির উত্তরাধিকার থেকে নারীকে দূরে রাখে । ভারতের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, মাত্র ১০% ভারতীয় নারী নিজস্ব জমির মালিক ।[৩১]

আমাদের দেশে নারীর আইনী অধিকার এবং ভূমিতে তাদের প্রকৃত অধিকারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে । খুব কমই দেখা যায় যে, নারীরা ভূমিতে যে আইনগত অধিকার পায় তার নিয়ন্ত্রণ চর্চা করে । এই পার্থক্য হয়ে থাকে কম বেশি - ক. জেন্ডার পরিচয় এবং চর্চার কারণে, যেখানে নারীরা প্রায়শ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তব্য জমির অধিকারের প্রশ্ন এবং এ সংক্রান্ত যথাযথ কাজ করার সক্ষমতার প্রশ্নে প্রায়শঃ বাধার সম্মুখীন হয় । খ. প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা, যা কিনা জেন্ডার নিরপেক্ষ নয়, বরং প্রথাগত পুরুষ মতাদর্শের ভিত্তিতে এই চর্চা হয়ে থাকে ।

কেন এটা হয়ে থাকে? একটা অবিসম্বাদী যুক্তি হচ্ছে নারীরা উত্তরাধিকারের মাধ্যমে জমি পায় না কারণ, জমি খন্ড-বিখন্ড হয়ে যায় যখন তা কন্যা ও তার পরিবারকে দেয়া হয়ে থাকে । কিন্তু যখন শুধুমাত্র ছেলে উত্তরাধিকার লাভ করে তখন তা পুরোটাই একত্রে থাকে । আরেকটা যুক্তি হচ্ছে যে, নারীরা বিয়ের কারণে এলাকা থেকে চলে যায় তাই সম্পত্তি নেওয়া হয় না । কিন্তু এক্ষেত্রে এই প্রশ্ন আসে যে, যদি কোন ছেলে চাকুরীসূত্রে অন্য জেলায় মাইগ্রেট করে তাহলে কি সে সম্পত্তি নেয় না? তাহলে নারীর ক্ষেত্রে বিবাহ সংক্রান্ত মাইগ্রেশনের প্রশ্ন কিভাবে আসে?

ঘ. প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অভিগম্যতা ঃ বেশিরভাগ নারীই হচ্ছে ভূমিহীন এবং তাদের কোন ঋণদান প্রতিষ্ঠানে অভিগম্যতা নেই, পশুপালন এলাকা ছাড়া । ঋণ শুধুমাত্র পাওয়া যায় জমি এবং সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে । এটা একটা বড় সমস্যা । কারণ অনেক এলাকার পুরুষদের স্থানীয়ভাবে এবং সাময়িক মাইগ্রেশনের হার অনেক বেশি এবং সেখানে নারীরা থেকে যায় খামারের দেখাশোনার প্রধান দায়িত্বশীল হিসাবে । কিন্তু সরকারি ঋণ ব্যবস্থাসমূহে এবং বিভিন্ন স্কীমে নারীর কোন অভিগম্যতা নেই ।[৩২]

ঙ. জেন্ডার মজুরীতে পার্থক্য ঃ নারী এবং পুরুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের একটি ফর্ম হচ্ছে মজুরী বৈষম্য । যদিও নারীরা তাদের আয়ের অধিকাংশ ব্যয় করে থাকে ঘরের যাবতীয় চাহিদার পূরণে, পুষ্টি সংযোজনে, অথচ তাদের মজুরী উল্লেখযোগ্যভাবে পুরুষের তুলনায় কম । নারী পুরুষ মজুরী বৈষম্য গ্রামাঞ্চলে এবং অঞ্চলভেদে হয়ে থাকে । FAO এর হিসাব মতে এশিয়ার প্রায় অধিকাংশ দেশে সমগ্র অর্থনীতিতে বিশেষ করে কৃষিতে

ফটো : আনোয়ার হোসেন

নারীর অবদান অনেক বেশি। বাংলাদেশে প্রথাগত মুসলিম দেশ হিসাবে, এখানে নারীরা ঘরের বাইরের কৃষিকাজে কমই অংশগ্রহণ করে থাকে। যদিও কৃষিতে নারীর অবদান বিবেচনা করা হয় মজুরীবিহীন পারিবারিক শ্রম, অপ্রধান কাজ হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে যদি এই মজুরীবিহীন কাজকে কাজ হিসাবে ধরা হত, তাহলে কৃষিতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা অনেক বেশি হতো।[৩৩]

চ. কৃষি সম্প্রসারণ সেবা থেকে নারীরা বিযুক্ত থাকে ঃ নারী কৃষকেরা সরকারিভাবে 'শ্রমিক' হিসাবে সম্প্রতিকালে স্বীকৃত হয়েছে,[৩৪] কিন্তু প্রচলিত ধারণার মধ্যে যেহেতু পুরুষদেরকেই কৃষক হিসাবে মেনে নেওয়া হয় তাই সকল কৃষি এবং তথ্য সেবা পরিচালিত হয় পুরুষ কৃষকদের কথা মনে রেখে। যদিও বেশির ভাগ কৃষি কাজ নারীদের দ্বারা সম্পাদিত হয়, কিন্তু সকল কর্মসূচিতেই নারীদের অদৃশ্যমানতা পরিলক্ষিত হয়। এমনকি কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হিসাবে নারীদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে এমনটি সংখ্যা হাতে গোনা মাত্র।

বাংলাদেশের সংবিধানের সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার স্বীকৃত। সংবিধানের ২৭ ধারায় বলা আছে যে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।' ২৮(১) ধারায় বলা আছে 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।'[৩৫] সংবিধানের তৃতীয় ভাগ-এ মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে নারী পুরুষভেদে, যেখানে কোন বৈষম্যকে স্বীকার করা হয় নি। সেখানে নারীর শিক্ষার, কর্মের, আইনের আশ্রয় লাভের, জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার দিয়েছে। চলাফেরার স্বাধীনতা, সমাবেশের, সংগঠন করার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা এবং আরও দিয়েছে সম্পত্তির অধিকার। এগুলো কোন বদান্যতা নয়, বরং নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

উপরোক্ত অধিকারসমূহ এটাই নির্দেশনা দান করে যে, নারীরা পুরুষের মতই একজন স্বাধীন নাগরিক। তাদেরও আছে পুরুষের মতই সমান অধিকার। বাংলাদেশ সরকার এসব অধিকার বাস্তবায়নে বিভিন্ন নীতিমালা

প্রণয়ন করেছে। অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনী সংস্থাও যেমন, Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) মৌলিক অধিকার হিসাবে এসবকে প্রবর্তন করে থাকে।

যেহেতু সংবিধানে উল্লেখ আছে যে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলেই সমান, সেহেতু নারীর সাংবিধানিক অধিকার আছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন, খাদ্য, শিক্ষা, সম্পত্তি, কাজ, সামাজিক সুরক্ষা, ভোট প্রদান এবং অন্যান্যদের মত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হবার অধিকার। নারীরা এসব অধিকার রাষ্ট্রের কাছে দাবী করতে পারে।

স্থানীয় সমাজভিত্তিক সংস্থার মাধ্যমে, বেসরকারি সংগঠনের সহযোগিতায় এবং সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে এসব দাবী নিয়ে বিভিন্ন এডভোকেসীমূলক কাজ করা যেতে পারে নারীদের সম্মিলিত কার্যক্রমের মাধ্যমে। জেন্ডার সম্পর্কিত যে কোন কৃষি-প্রতিবেশ নির্ভর আলোচনা এবং কর্মকান্ডে নারীর সাংবিধানিক সকল অধিকার এবং নাগরিকত্বের অধিকারগুলো কার্যক্রমে থাকাটা জরুরী।

ফটো: চৈতন্য কুমার দাস

কৃষি-প্রতিবেশ ঃ কাঠামো বনাম রূপান্তর

কৃষি প্রতিবেশ বিষয়টি বিকশিত হয়েছে বেশ কয়েক বছর ধরে। বিজ্ঞানী, কৃষক এবং ভোক্তাদের আন্দোলনের ফলে এটি টেকনিক্যাল জগত থেকে মোড় নিয়েছে সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে, যেমন খাদ্য সার্বভৌমত্ব। কৃষি প্রতিবেশ একে খামার থেকে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতিস্থাপিত করেছে। সবার জন্যে এটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত খাদ্য সার্বভৌমত্বের সাথে এবং সামাজিক ন্যায্যতা হচ্ছে এর দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক অংশ।

কিন্তু কৃষি প্রতিবেশ সব জায়গায় একই অর্থ বহন করে না। বর্তমানে এটা একটা বিতর্কিত (সর্বজনগ্রাহ্য নয়) ধারণা বা পদ। এই শব্দটি সম্পর্কে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছে কিন্তু সবার কাছে তা সমভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি। সংজ্ঞা গুরুত্বপূর্ণ কারণ সকল ধরনের কৃষি প্রতিবেশ স্বতঃসিদ্ধভাবে মুক্তির কথা বলে না, অথবা জেন্ডার অসমতার মত সামাজিক বৈষম্যের কথা উদ্দেশ্যমূলকভাবে তুলে ধরে না। কৃষি-প্রতিবেশ সম্পর্কিত কিছু ধারণা প্রকৃতিগতভাবে শুধুই টেকনিক্যাল। কিছু প্রতিবেশগত নীতি সংযোগ করা হচ্ছে উৎপাদনের রাসায়নিক মডেল এর সঙ্গে, সে বিষয়ে অন্যরা সম্পৃক্ত। যদিও কৃষি প্রতিবেশ সম্পর্কিত সকল ধারণার মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকে, এমনকি জেন্ডার সম্পর্কিত অঙ্গীকার থাকলেও, সেখানে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়ে যায় এখনও। উদাহরণস্বরূপ জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি বা Climate Smart Agriculture (CSA) সম্পর্কিত কর্পোরেট আইডিয়া হিসাবে ইদানিং এগ্রোইকোলজি বা কৃষি প্রতিবেশ সামাজিক আন্দোলনে জেন্ডার সমতা আনয়নে প্রবর্তন করা হচ্ছে। সবুজ বিপ্লবের দায় কাটিয়ে ওঠার আগেই জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এই জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষির তত্ত্ব সামনে হাজির করেছে এবং এই তত্ত্বের প্রচারে ও বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংকসহ পৃথিবীর বড় বড় কর্পোরেট শক্তি ও তাদের সাহায্যপুষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেছে। এই তত্ত্বে কৃষি প্রতিবেশ সম্পৃক্ত এবং জেন্ডার সমতা অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গৃহিত হয়েছে।[৩৬] কিন্তু আমরা পরবর্তীতে দেখি যে, দুটি প্রচেষ্টা মৌলিকভাবে পৃথক।

বাংলাদেশে কৃষি-প্রতিবেশ এখনও পর্যন্ত বহুল আলোচিত বিষয় নয় এবং এই বিষয়ে কাজ মাত্র শুরু হয়েছে কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এখনও কৃষি-প্রতিবেশ নিয়ে কোন সংজ্ঞায়ন হয়নি, তবে জৈব কৃষি নীতি প্রণীত হয়েছে। বর্তমানে জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষির তত্ত্ব বাস্তবায়নের প্রতিও ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে, ভারতে কৃষি-প্রতিবেশ সম্পর্কে রাষ্ট্র যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে এবং সামাজিক আন্দোলনের দ্বারা যেভাবে সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে তা ভিন্ন। Pimbert ফ্রান্স থেকে উদাহরণ দিয়েছেন।[৩৭] The French National Institute of Research in Agriculture (INRA) তাদের ২০১০-২০২০ কৌশলগত গবেষণা পরিকল্পনায় কৃষি-প্রতিবেশকে বাস্তবায়ন করছে, কিন্তু নাগরিক সমাজগোষ্ঠী এবং কৃষকদের নেটওয়ার্ক যুক্তি তুলে ধরছে যে, ফরাসী সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে আগাছানাশক স্প্রে ব্যবহারসহ ভূমিকর্ষণ ছাড়া চাষ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কৃষি-প্রতিবেশ গঠন একেবারে ভিন্ন এবং তৃণমূল গ্রুপগুলো যেভাবে প্রবর্তন করে থাকে তার থেকে দূরত্ব রয়েছে। "তৃণমূল গ্রুপগুলো ফরাসী সরকারকে জিজ্ঞেস করা ছাড়াই কৃষি সংস্কার করে থাকে, যা মানব স্কেল নির্ভর বিভিন্ন ধরনের জৈব কৃষি সমর্থন করে। তাদের জন্যে কৃষি-প্রতিবেশ বৃহত্তরভাবে উৎপাদক ভোক্তার সম্পৃক্ততা, চাকুরী সৃষ্টি, একটি সংহত অর্থনীতি এবং নাগরিকের জন্য বিভিন্ন ধরনের খাদ্য তৈরি করার সমার্থক।" স্পষ্টভাবেই দ্বিতীয় বক্তব্য অনেক বেশি রাজনৈতিক এবং খাদ্য ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরে। ফরাসী রাষ্ট্রীয় যে পন্থা সেখানে শুধু দেখা হয় যে, কৃষি-প্রতিবেশ সবুজ কৃষি শিল্পের একটা টুল মাত্র।

একই ধরনের আর একটি উদাহরণ হচ্ছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বা UN Food and Agriculture Organization (FAO)-এর কৃষি প্রতিবেশ সম্পর্কে আইডিয়া যা কিনা ইদানীং প্রবর্তন করা শুরু হয়েছে। যেখানে নাগরিক সমাজ স্বীকার করে যে, কৃষি-প্রতিবেশের জন্য এ ধরনের জায়গা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং নজিরবিহীন। তারা কৃষি-প্রতিবেশ সম্পর্কে খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পদ্ধতিকে সমালোচনা করে থাকে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, সরকার এবং বেসরকারি খাত স্বীকার করে যে, কৃষি-প্রতিবেশ হচ্ছে চাষাবাদের

বিকল্প পদ্ধতি (tool) যা শিল্প কৃষি উদ্ভূত সমস্যা ও ঘাটতি পূরণে কাজ করে। তারা অবশ্য আরও নতুন বিতর্কমূলক এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে, যেখানে অন্যান্যের মধ্যে আছে Climate Smart Agriculture বা জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি নামে, আরও আছে No till অর্থাৎ যেখানে ভূমিকর্ষণ ছাড়াই শস্য চাষ হবে। চাষ হবে আগাছা নাশক, বিষাক্ত পোকামাকড়, অন্যান্য ছত্রাক প্রতিরোধী শস্য এবং জেনেটিক্যালী মডিফায়েড শস্য।

তাদের কাছে কৃষি-প্রতিবেশ জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষির বিভিন্ন উপাদানের স্রেফ একটি উপাদান মাত্র। জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষির আরও অন্যান্য উপাদানসমূহ সরাসরি কৃষি প্রতিবেশ-এর ভিত্তিকে দুর্বল করে থাকে। এটি গভীরভাবে আলাদা সামাজিক আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যেমন LA Via Campesina আন্দোলন, যাদের কাছে কৃষি-প্রতিবেশ একটি মৌলিক এবং একক বিকল্প, বিদ্যমান কৃষি খাদ্য ব্যবস্থাকে রূপান্তরণের জন্য।[৩৮] তারা দেখেছে কৃষি-প্রতিবেশ হচ্ছে মূল সমাধান, জলবায়ু, এনার্জি এবং অর্থনৈতিক সংকট এবং সামাজিক অসমতা যেসবই শিল্প কৃষির উপর নির্ভরশীল, সেসব সমস্যার মূল সমাধান আছে কৃষি-প্রতিবেশে।

'রূপান্তরণ' বা transform হচ্ছে এখানে মূলশব্দ। প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীতে কৃষি প্রতিবেশকে দেখা হয় খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তরণ হিসাবে, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক বা কর্পোরেট গোষ্ঠী কৃষি প্রতিবেশকে দেখে 'গঠন' (conform) হিসাবে যা কিনা বর্তমান কৃষি শিল্প মডেলই, শুধু সেখানে একটু সবুজের প্রলেপ দেয়া মাত্র।

আগেই উল্লেখ করেছি, বিশ্বব্যাংক এবং জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি (CSA) প্রস্তাবনায় জেন্ডার সমতার কথা বলা শুরু হয়েছে বিভিন্ন জলবায়ু নির্ভর কৃষি বিষয়ক (CSA) প্রকল্পসমূহে।[৩৯] তারা কথা বলছে ঋণ, জমি, সম্পদ, জেন্ডার সহায়ক কৃষি নীতিতে নারীর প্রবেশাধিকার বা অভিগম্যতা নিয়ে। শুরুতেই এসব যুগপৎভাবে ঘটে কৃষি-প্রতিবেশের ভিশনের সাথে। যদিও কারও মনে হতে পারে যে, দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষির কর্পোরেট ভাষ্য অনুযায়ী তা নারী এবং পুরুষের ওপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলবে যখন তারা একে প্রবর্তন করবে ব্যবসা হিসেবে, যেখানে কৃষকরা নির্ভরশীল বাইরের কর্পোরেট টেকনোলজি এবং খামারের জন্য উৎপাদনের উপর। একই সাথে টেকনোলজি ও উৎপাদনভিত্তিক নির্ভরতা খামারকে ক্ষয়িষ্ণু করে তোলে। সবশেষে জনগণের অধিকারের চেয়ে এসবই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লাভের জন্যে। এ ধরনের যুক্তিসাপেক্ষ ব্যবসায়ী ঋণের সাথে জড়িয়ে পড়া এবং একই সাথে চর্চা ক্রমাগত বাজার নির্ভরতা বাড়িয়ে তুলছে এবং মানবিক সংকট তৈরি করছে। যেমন কিনা বাংলাদেশে প্রান্তিক কৃষকগোষ্ঠী ক্রমাগত কৃষি থেকে নিজেদেরকে বিযুক্ত করছে এবং শহরে মাইগ্রেট করছে, জীবিকা বদল করছে। আর বর্তমানে ভারতে কৃষকদের আত্মহত্যা মহামারী রূপ ধারণ করেছে। বাইরের কর্পোরেট ইনপুট এবং বাজারের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা কখনই কৃষক পরিবারের জীবন যাপনের উন্নয়নে সহায়ক নয়, বিশেষভাবে নারীদের জন্য।

অন্যদিকে কৃষি প্রতিবেশ হচ্ছে স্বায়ত্বশাসন, যার অর্থ স্বাধীনতা এবং স্বনির্ভরতা। যখন কিনা কৃষক পরিবার নিজেদের সংরক্ষণ করে রাখা বীজের উপর নির্ভর করে, বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উৎপাদন এবং কম ইনপুট সহযোগে জীববৈচিত্র্য নির্ভর, কৃষি-প্রতিবেশ নির্ভর উৎপাদন পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। তাদের হাতে থাকে বিকল্প, যেখানে জীবন যাপনের জন্য ঋণের চক্রজাল, ব্যয়বহুল কৃষি উৎপাদনের উপকরণ ক্রয়ের সমস্যা নেই, রাসায়নিকের ব্যবহারের কারণে স্বাস্থ্যঝুকি নেই। কৃষি প্রতিবেশ মৌলিকভাবে বাহ্যিক ব্যয়বহুল কৃষি উপকরণ বা কর্পোরেটদের থেকে কৃষকদের বিযুক্ত করে স্বনির্ভরতা আনয়নে সহায়তা করে।

ফটো: চৈতন্য কুমার দাস

কৃষি-প্রতিবেশ কি জেন্ডার সমতা তৈরি করতে পারে?

“যদি আধুনিকীকরণ কৃষিভিত্তিক সমাজে জেন্ডার সম্পর্কের রূপান্তরণ ঘটায় এবং নারীকে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে কিভাবে বিকল্পধারার কৃষি, যেমন কৃষি-প্রতিবেশ নারীর জন্য অধিকতর ক্ষমতা সৃষ্টি করতে পারে।”[৪০]

উপরোক্ত আলোচনা এটা প্রতিষ্ঠা করেছে যে, সব কৃষি-প্রতিবেশ একই রকম নয়। এটা উল্লেখ্য যে, সামাজিক আন্দোলন, বেসরকারি সংগঠন, কমিউনিটি এবং কৃষি-প্রতিবেশে নিবেদিত সক্রিয় কর্মীরা (activist) স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেন্ডার সমতার রাস্তা তৈরি করে না, যদি না তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এবং একনিষ্ঠভাবে তা না করে থাকে। নারীদের দ্বারা পরিচালিত কৃষি-প্রতিবেশ বা জৈবকৃষি আন্দোলনের একটি মৌলিক সমালোচনা হচ্ছে যে, তারা মুহূর্তের অংশীদার, যেখানে জেন্ডার ফ্রন্ট থেকে অনেক বেশি ঐক্যনির্ভর শক্তি প্রদান জরুরী।

“জৈবকৃষি বা এগ্রোইকোলজিতে জেন্ডার সম্ভাবনা উপলদ্ধি করা যাবে না যদি না সেখানে অনেক বেশি ঐক্যনির্ভর শক্তি, নিবেদিতপ্রাণ এবং ত্যাগী কৃষক (যাদেরকে বিকল্প কৃষক বলা যায়) এবং ভোক্তা একত্রে বিকল্প কৃষি সংরক্ষণ না করে। শুধুমাত্র বিকল্প কৃষি আন্দোলনেই নয়, বরং সামাজিক বিচার (ন্যায্যতা) আন্দোলনে জেন্ডার সমতা সুনির্দিষ্টভাবে নিবেদন করতে হয়।”[৪১]

দেখা গেছে যে কৃষি-প্রতিবেশ আন্দোলনে অনেক কর্মী সামাজিক বিচার নীতির সঙ্গে জেন্ডার সমতার অঙ্গীকার করে থাকে। নারী কৃষকরা এটা হিসাবে রাখে যে, এসব মৌখিক অঙ্গীকার বাস্তব কর্মকান্ডে খুব সুনির্দিষ্টভাবে দেখা যায় না।[৪২] উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে বিখ্যাত কিউবার কৃষক সমাজে ছড়ানো কৃষি-প্রতিবেশ আন্দোলন দেখায় যে, গৃহের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী শীর্ষ ভূমিকা পালন করছে, কিন্তু তা কৃষি-প্রতিবেশ আন্দোলনে

অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জেন্ডার সমতা আনতে পারেনি। সেখানে দেখা গেছে যে, নেতৃত্ব পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে পুরুষের তুলনায় কম।[৪৩] এটা খুবই স্পষ্ট ছিল যে, আন্দোলনের জন্যে নারী কর্মীদের, বিশেষ করে আন্দোলনে সমন্বয়কারী এবং নেতাদের নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণে আরও সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা নেয়া জরুরী ছিল।

একইভাবে বিশ্বের আরও অন্যান্য কৃষি-প্রতিবেশ আন্দোলনে, কৃষক আন্দোলনসহ, নারীদের উপস্থিতি আরও বেশি সংখ্যায় হতে পারত, কিন্তু তাদেরকে নেতা হয়ে ওঠার তুলনায় কৃষকের বউ হিসেবে একপাশে রাখা, অথবা বিশেষভাবে নারীদের জন্য অন্য কোন কার্যক্রম বা জায়গা সৃষ্টি না করা, যেখানে তাদের নিজেদের বিষয়গুলো শেয়ার করার আরও স্বাধীনতা, আশা-আকাঙ্খা, সংহতি সৃষ্টি এবং নারী হিসেবে তারা যেসব সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে চায়, সেসব আড়ালে রাখার প্রবণতা ছিল। কর্ণাটক রাজ্যে শূন্য বাজেটে প্রাকৃতিক কৃষি (zero budget netural farming) সংক্রান্ত ভারতের একটি সমীক্ষার ফলাফলও তাই ছিল। Karnatake Rajyo Raitha Shongho এবং অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের প্রবর্তিত কৃষক আন্দোলনে যা দেখা গিয়েছিল।[৪৪] কৃষি-প্রতিবেশ প্রবর্তকদের এ ধরনের দায়িত্ব নেয়া জরুরী এবং নিশ্চিত করা যে, নারীদের জন্য যথাযথ ধরনের স্পেস তৈরি করা, যেখানে নেতৃত্ব, মতবিনিময়, শেখার সুযোগ, আয় করা এবং অন্যান্য কর্মকান্ড যা নারীরা করতে চায় তা করতে পারে।

ফটো: চৈতন্য কুমার দাস

জেন্ডার উপযোগী স্পেস তৈরি করা

কখনও কখনও মিশ্র জেন্ডার স্পেস নারীর জন্য যথাযথ নয়। নেতৃত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সক্ষমতা তৈরির সম্ভাবনায় নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং চর্চা করার জন্যে শুধুমাত্র নারীদের জন্যে স্পেস অনেক বেশি কার্যকরী হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতে, শুধুমাত্র নারীদের সমবায়, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং অন্যান্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা যেখানে নারীরা একই সামাজিক প্রেক্ষিত থেকে উঠে এসেছে, সেখানে নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্যভাবে মোড় নিয়ে ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। যখন কিনা আমরা দেখি যে, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে শুধু

নারীদের গোষ্ঠীগুলো উল্লেখযোগ্যমাত্রায় সমাজ পরিবর্তনে, নারীদের স্পেস সৃষ্টিতে এবং নারীর ক্ষমতায়নে উত্তরোত্তর ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। অন্যদিকে অনেক সমবায় বা গ্রামীণ সংঘ বা গোষ্ঠী আছে যেখানে পরিবারের সকলেই সদস্য। দেখা যায় যে, সেখানে একজন মাত্র পুরুষ সদস্য অংশগ্রহণ করছে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ করছে, অথচ সেখানে নারীদেরকে সমিতির জন্য জরুরী হিসাবে বাড়তি কাজের বোঝা নিতে হচ্ছে।[৪৫] এই ধরনের কেস-এ কৃষক পরিবার হয়ত সবসময় একশনের জন্য যথাযোগ্য ইউনিট নয়, কেননা সেখানে নারীদেরকে গৃহবধূ এবং তাদের কাজকে মজুরীহীন এবং মর্যাদাহীন হিসাবে দেখানোর প্রবণতা থাকে।[৪৬]

আবার সবাই নারী সদস্য হলেও যেখানে শ্রেণি, বর্ণ এবং অর্থবিত্তের পটভূমি আছে, যেখানে ভূমিহীন এবং ভূমির মালিকরা একই গ্রুপের সদস্য থাকে সেই কৃষি-প্রতিবেশ প্রকল্পভিত্তিক গ্রুপে বর্ণ/শ্রেণিভিত্তিক উচু নিচু বোধগুলো কাজ করে। এখানে প্রধান বিষয়টা হচ্ছে যে, সকল নারী একই রকম বা সমান নয়, এবং সেখানে কৃষি-প্রতিবেশ প্রবর্তন করার যে কোন প্রচেষ্টায় অবশ্যই ক্ষমতার সক্রিয়তা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে তা সব নারীর উপর একই প্রভাব পড়বে এমনটি আশা করা উচিৎ হবে না।[৪৭]

যখন উপরোক্ত বিষয়গুলো যে কোন জেন্ডার সম্পর্কিত কাজে সব সময় একইরকম থাকে না সেখানে অবশ্যই সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন পুরুষ, নারী, সকল পরিবার এবং সম্প্রদায়। যে পদ্ধতিতে করা হবে সেখানে নিশ্চিত করতে হবে যে, যাতে সামাজিক অসমতার পুনরুৎপাদন না হয়, এবং এগ্রোইকোলজি প্রকল্পের মাধ্যমে তা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।

জেন্ডার বৈষম্য নিয়ে সম্মিলিত কার্যক্রমে যাওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি

একের মাধ্যমেই পরিবর্তন শুরুর সমালোচনামূলক শিক্ষা ঃ জেন্ডার বৈষম্য নিয়ে সম্মিলিত কার্যক্রমে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটা কার্যকরী এপ্রোচ হচ্ছে একজনকে দিয়ে শুরু করা, তার ব্যক্তিগত দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এবং সংগ্রাম নিয়ে।[৪৮] এই পদ্ধতি সমালোচনামূলক শিক্ষকবৃন্দ দ্বারা প্রবর্তিত। ঐ শিক্ষা হয়ে থাকে প্রত্যেকের নিজস্ব বাস্তবতা বিশ্লেষণে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে। অসমতা/নির্যাতন ঐতিহাসিক জানা বোঝা এবং অবশ্যই এর রাজনৈতিক প্রকৃতি - বাস্তবতার রূপান্তরকে দেখা উচিৎ। অসমতাকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে মুক্তি, মুক্তি অর্থ নির্যাতনমূলক সামাজিক সম্পর্ক থেকে স্বাধীনতা। সচেতনতার প্রক্রিয়া প্রস্তাব হয়েছে, যেখানে এই বিষয়কে দেখতে হবে যে, যে ধরনের অসমতা এবং নির্যাতনের তারা মুখোমুখি হয় তা 'স্বাভাবিক' নয়, অথবা স্বাভাবিক হিসাবে স্বীকৃত নয়। এটা একটা বিষয় বোঝার ব্যাপার যে, নারীদের বাস্তবতাকে সুষ্ঠুভাবে দেখা দরকার নিজস্ব এজেন্সি এবং সম্মিলিত কার্যক্রমের মাধ্যমে। জেন্ডার ন্যায্যতা নিয়ে বিভিন্ন কর্মীরা যে কাজ করে তারা এই পদ্ধতিকে প্রস্তাব করেছে কার্যক্রম এবং রূপান্তরণকে জাগিয়ে তোলার জন্য।

Amrita Bhoomi দেখিয়েছেন যে, কৃষকদের কৃষি-প্রতিবেশ স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এটা হয়েছে কর্ণাটক রাজ্য রাইতা সংঘের কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে। জেন্ডার এবং কৃষি বিষয়ক সাম্প্রতিক কোর্সসমূহে ছাত্রদেরকে তাদের নিজেদের জীবনের প্রেক্ষিতে জিজ্ঞেস করা হয় যে নারী এবং পুরুষ হিসাবে তারা নিজেদের জীবন থেকে কি প্রত্যাশা করে থাকে[৪৯] এবং কিভাবে এর পরিবর্তন সম্ভব।

Brazil's landless Peoples Movement (MST)র জন্য ক্রিটিক্যাল শিক্ষা হচ্ছে কেন্দ্রীয় বিষয়, নয়া উদারতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য জেন্ডার সমতার সাথে যৌথভাবে কৃষি-প্রতিবেশ বিষয়ে MST অনেকগুলো ক্রিটিক্যাল শিক্ষার মডেল তৈরি করেছে, যেখানে নারীরা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। কৃষি-প্রতিবেশ বিষয়কে MST শিক্ষা আলোকপাত করে, যেখানে জেন্ডার আলোকিত শিক্ষণ প্রক্রিয়া রয়েছে। এটি নারী পুরুষকে ক্ষমতায়িত করে থাকে, গ্রামীণ সমাজের তথাকথিত লিঙ্গভিত্তিক বিভাজনকে ভেঙে টুকরো টুকরো করার মাধ্যমে।[৫০]

গণগবেষণা ঃ রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) নামে বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় তাদের কাজের মাধ্যমে এই তত্ত্বের অবতারণা করেছে। বাংলাদেশে গণগবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মধ্যে এই ক্ষমতার স্ফুরণ দেখা যায়। এই তত্ত্বের মূল বিষয় হচ্ছে অংশগ্রহণ। অংশগ্রহণ জ্ঞানের জগতে, চিন্তায়, সৃষ্টিশীলতায় এবং কাজের মাধ্যমে। সাধারণতঃ জ্ঞান সৃষ্টি এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষমতার সম্পর্ক নিহিত থাকে। যিনি জ্ঞান সৃষ্টি করেন তিনি থাকেন ক্ষমতার উচ্চ স্তরে, সাধারণ মানুষের থেকে অনেক দূরে। আর যাদের জন্যে জ্ঞান তৈরী করা হয় যেমন নারী, আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠী, অধিকার বঞ্চিত মানুষ তারা থাকেন কেবলই জ্ঞানের উপলক্ষ্য হয়ে।[৫১]

গণগবেষণা *ফটো: চৈতন্য কুমার দাস*

গণগবেষণার মূল ধারণাটি হল চিন্তাশক্তি ও জ্ঞানের দিক দিয়ে কোন শ্রেণীই কোন শ্রেণীর চাইতে 'অগ্রসর' নয়। বাস্তবে যা ঘটে তা হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রামের কারণে কারও চিন্তা করার অবকাশ বেশী কারও কম। কেউবা বেঁচে থাকার জন্য স্থানীয় ক্ষমতাবান শ্রেণীর কাছে চিন্তা সমর্পন করেন। এরকম সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা সাধারণ মানুষের চোখে 'বুদ্ধিবৃত্তিক' শ্রেণী বলে বিবেচিত হয়। উন্নয়নশীল দেশে মনে করা হয় মধ্যবিত্ত বা তার উপরের শ্রেণী অনেক বেশী লেখাপড়া শিখেছে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়েছে। সুতরাং তারা অনেক বেশী জানে। ফলে, অনেকে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে শিক্ষিতদের মত চিন্তার ক্ষমতা তাদের নেই এবং তারা শিক্ষিত শ্রেণীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তবে, তার মানে এই নয় যে তাদের চিন্তার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে, বরং হয়তো সেটার ধার কমেছে মাত্র। গণগবেষণার একটি প্রধান লক্ষ্য সাধারণ মানুষের মরচে ধরা চিন্তাশক্তিকে আবার শাণিত করা যাতে তারা গভীর সমাজ বিশ্লেষণে নিয়োজিত হন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা একধরনের জ্ঞান দেয়, কিন্তু ব্যবহারিক শিক্ষাও একধরনের জ্ঞানের সৃষ্টি করে। গণগবেষণা মনে করে জ্ঞান উদ্ভূত হতে পারে মানুষের পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে, ব্যক্তির জীবন ও কর্ম থেকে। এধরনের জ্ঞান কৃষক-শ্রমিক- নারী-অন্ত্যজ জনগোষ্ঠী - সকলের মধ্যেই বিদ্যমান।[৫২]

গণগবেষণা শব্দটির পেছনে আরও একটি নাম জড়িয়ে আছে, তিনি Paulo Freire।[৫৩] তিনি চিন্তা করেছিলেন যে, মানুষ সমাজের বাস্তবতাকে বুঝতে পারবে আনুষ্ঠানিক জ্ঞান নয়, বরং সামষ্টিক নিজস্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এভাবে এক সময়ে তারা সমস্যাকে বুঝতে পারবে নিজেদের বাস্তবতায়। মানুষ তাদের নিজ উদ্যোগের দ্বারা নিজেরাই সমাজে পরিবর্তন আনতে পারবে। যা তাদেরকে নতুনতর উদ্যোগ নিতে উৎসাহ দেবে। গণগবেষণার এই ধারাকে বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োগ করেছেন অধ্যাপক মো: আনিসুর রহমান। পরবর্তীতে এটি প্রসারিত হয় বেসরকারি সংস্থা রিইব, ব্রতী এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কাজের মাধ্যমে।

গণগবেষণা কাজ করে গণ আত্মউন্নয়ন চিন্তার প্রেক্ষিতে। এই পদ্ধতির কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষের স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহণ। যে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষের সৃষ্টিশীলতার বিকাশ ঘটে থাকে। এই অংশগ্রহণ একক নয়, যৌথ। এতে পারস্পরিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে একের ভাব সমৃদ্ধ ও ধারালো হতে পারে। এর মাধ্যমে মানুষের আত্মশক্তির বিকাশ ঘটে। গণগবেষণায় মানুষের আত্মশক্তির বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে উজ্জীবক, যিনি সম্প্রদায়ের ভেতরের বা বাইরের হতে পারেন। উজ্জীবকের কাজ হচ্ছে জনগোষ্ঠীর আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে তাদের সমস্যা চিহ্নিত করা, সেই সমস্যার সমাধান অন্বেষণ করা এবং সমাধানে কর্মোদ্যগ গ্রহণ করা। পরিশেষে কাজের মূল্যায়ন করা। চিন্তা-কাজ-চিন্তা-কাজ ধারাবাহিক এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই জনগোষ্ঠীকে ক্রমশ: উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। পুরো প্রক্রিয়াটি যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয়ে থাকে। গণগবেষণায় এই প্রক্রিয়াকেই বলা হয়ে থাকে প্রাক্সিস।

সমস্যা চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে সমাধানের পথে যাত্রার পুরো প্রক্রিয়াটি লিপিবদ্ধ করে জনগোষ্ঠীর কাছে উপস্থাপন করে তাদের মতামত ও অনুমতি গ্রহণের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং এভাবে জনগোষ্ঠীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। যা তাদের স্বনির্ভরতার পথে সহায়ক বলে বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশে গণগবেষণার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন যেমন সম্ভব হচ্ছে, তেমনি কৃষি-প্রতিবেশ নির্ভর চাষাবাদে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে। পরবর্তীতে বর্ণিত কেসস্টাডিতে যার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

ফটো: চৈতন্য কুমার দাস

গৃহের পরিসরে কৃষি-প্রতিবেশের প্রভাব

La Via Campasina এবং The Asociacion Nacional de Agricultores Prquenos (ANAP) এর উদ্যোগে কিউবাতে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রথাগত মনোকালচার কৃষি থেকে কৃষি-প্রতিবেশভিত্তিক কৃষিতে পরিবর্তনের কালে কৃষক পরিবারের অভ্যন্তরে ঐতিহ্যগত জেন্ডার ভূমিকা এবং ক্ষমতা সম্পর্ক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে।[৫৪] কৃষক নারীরা বলে থাকে যে, গতানুগতিক (conventional) মনোকালচার পদ্ধতিতে, শস্য সম্পৃক্ত পুরুষের সাথে। পুরুষ ট্রাক্টর চালায়, রোপন করে, রাসায়নিক প্রয়োগ করে, ফসল তোলে এবং শস্য বিক্রি করে। শস্য বিক্রির সকল অর্থ তার কাছেই যায়। 'পুরুষ হচ্ছে রাজা'[৫৫] কিন্তু যদি খামার একাধিক কৃষক ভিত্তিক পদ্ধতিতে থাকে, তাহলে একক বা যৌথ পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের ভূমিকা এবং অর্থোপার্জনের সুযোগগুলোও বিভিন্ন থাকে। পুরুষরা এখনও পর্যন্ত ক্ষেতের ফসল চাষবাস করে থাকে কিন্তু এর বাইরের অতিরিক্ত কাজ যেমন, পশুপালন, কেঁচো চাষ, ওষধি গাছ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত এবং আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকে নারীর। এমনকি কিশোরী এবং বৃদ্ধ দাদী-নানীদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করার ক্ষমতা থাকে। দেখা যায় যে, কিছু গৃহপালিত পশু-পাখী পালিত হয় শিশুদের দ্বারা, কিছু ফলের গাছ দাদী-নানীদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এর ফলে পরিবারের অভ্যন্তরে নারীদের কিছু ক্ষমতার স্পেস তৈরী হয় এবং পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে থাকে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, কৃষক পরিবারে সব নারীরাই একইরকম ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা ভোগ করে না; উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে নারীরা গবাদিপশুর লালন-পালন করে থাকে, কিন্তু এর দুধ বিক্রি করে যে আয় হয় তা নিজেরা নিতে পারে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিবার হয়ে থাকে পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের একটি জায়গা। সেক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট হয়েছিল যে, কৃষক সমাজের আন্দোলনে অংশগ্রহণ ছিল একটি মৌলিক বিষয় এবং যা জেন্ডার অসমতাকে সামনে নিয়ে এসেছিল। এএনএপি-র সকল কৃষক সদস্যরা কৃষি-প্রতিবেশ আন্দোলনের কর্মসূচীর সময় জেন্ডার ইস্যু সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল, এবং এটি সকল সম্ভাব্যতা নিয়ে ঐসব গৃহের নারীদের আয় এবং সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল।

ফটো: আনোয়ার হোসেন

কিভাবে কৃষি-প্রতিবেশ নারীর জন্যে অনেক বেশি সুযোগ তৈরী করে?

১. কৃষি-প্রতিবেশ তাৎপর্যপূর্ণ কাজের সৃষ্টি করে ঃ যেহেতু কৃষি প্রতিবেশ বিভিন্ন ধরনের কাজ, বিশেষ দক্ষতা এবং সুনির্দিষ্ট জ্ঞানকে সম্পৃক্ত করে, নারী তাই গৃহস্থালী অর্থনীতিতে প্রায়শ: বহুমাত্রিক ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রথাগত একক উৎপাদনমূলক রাসায়নিক কৃষির বিপরীতে, কৃষি প্রতিবেশে নারীদের সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং আয়বর্ধক ভূমিকাতে বৈচিত্র্য দেখা যায়। এসব কাজই পরিবার ইউনিটের অভ্যন্তরে পিতৃতন্ত্রের দাপটকে কমাতে সাহায্য করে।

২. জ্ঞান অর্জন, মত বিনিময় এবং সামাজিক বন্ধন হচ্ছে কৃষি প্রতিবেশ -এর মূল বিষয় ঃ যেহেতু পরস্পর থেকে শেখা এবং কৃষি প্রতিবেশ-এর মূল বিষয় একে অপরের সাথে মতবিনিময় করা হয়, ফলে মিটিং এবং সামাজিক বন্ধন সৃষ্টির জন্যে এটি ক্রমশ: সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে। বিশেষ করে নারীদের জন্যে এই স্পেস বিভিন্ন বিষয় সংগঠিত করার সুযোগ দেয়; লিঙ্গ সমতা, ঐক্য সংহত করা এবং সামাজিক বন্ধন শক্তিশালী করা। অন্যদিকে কৃষি প্রতিবেশ সৃষ্টিশীলতাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং খামারের পুরস্কৃত হবার পথ সৃষ্টি করে, নারীর সৃষ্টিশীল দক্ষতা এবং সম্মিলিত কাজকে শক্তিশালী করে।

৩. অর্থনৈতিক সুযোগের প্রস্তাবনা দেয় ঃ কৃষি প্রতিবেশ এর মাধ্যমে চাষাবাদে প্রাথমিক বিনিয়োগ ও উৎপাদন খরচ স্বল্প, সহজ এবং কার্যকর, সবসময়ই ফসলের পরিমাণ স্থিতিশীল থাকে, এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ কম ঝুঁকিপূর্ণ, নারীদের জন্য প্রবেশাধিকারযোগ্য সামর্থ্যের মধ্যে থাকে। অন্যদিকে গৃহের পুষ্টির স্বাধীনতা ছাড়াও, কৃষি-প্রতিবেশের মাধ্যমে উৎপাদিত হাই ভ্যালু পণ্য বাজার সৃষ্টি করে ভালো আয়ের জন্যে। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে বাজারে অর্গানিক খাদ্যের এবং গুণগত মান সংযোজিত খাদ্যের বিপুল চাহিদা রয়েছে, যা নারীদের সম্পৃক্ত হবার বিপুল পরিমাণ সুযোগ সৃষ্টি করছে। কৃষি প্রতিবেশ একইসাথে গৃহপালিত পশুর খামারের

মাধ্যমে বিচালী উৎপাদনকে সম্পৃক্ত করার প্রতি জোর দিয়ে থাকে। পশুপালন বিশেষভাবে দেখায় যে, এটি নারীর জন্য লাভজনক, এটি খাদ্য ও পুষ্টি যোগায় এবং নারীর জন্য অতিরিক্ত অর্থ আয়ের সুযোগ করে দেয়।

৪. স্বাস্থ্য সহায়ক ঃ কৃত্রিম রাসায়নিক নিষিদ্ধতার ফলে কৃষি শ্রমিকদের এবং ভোক্তাদের স্বাস্থ্য উন্নত হয়। কীটনাশকের মত বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য অনেক ধরনের ব্যাধির সূতিকাগার, যেমন ক্যানসার। অন্যদিকে শস্যবৈচিত্র্যে সরাসরি প্রবেশাধিকার থাকার ফলে ফলমূল এবং পশুজাত খাদ্য পরিবারের পুষ্টির স্বাধীনতা প্রসারিত করে থাকে।

৫. জীববৈচিত্র্য এবং প্রথাগত জ্ঞানকে উৎসাহ প্রদান করে ঃ কৃষি খামারে জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার আরও বেশি করে চর্চা করার মাধ্যমে উন্নততর করার মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে - কৃষি প্রতিবেশ। এই তত্ত্ব আরও উৎসাহিত করে স্থানীয় বীজ এবং শস্য, যা স্থানীয় জলবায়ু উপযোগী এবং প্রথাগত কৃষক জ্ঞানের সহযোগী হয়ে থাকে। এসবই নারীদের বৃহত্তর ভূমিকা প্রদান করে থাকে, যারা কিনা ঐতিহ্যগতভাবে বীজ এবং প্রথাগত জ্ঞান সংরক্ষণ করে থাকে।

নারী, পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন (Women, Environment and Sustainable Development) নীতিমালায় বলা হয় যে, প্রকৃতি এবং নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য সমান্তরালভাবে বিদ্যমান। উন্নয়ন পরিকল্পনায় পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দাপট তৃতীয় বিশ্বে পরিবেশের বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এর থেকে মুক্তি পেতে নারীর লোকজ জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে, কেননা লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন নারীকে প্রকৃতির কাছে ঠেলে দিয়েছে। পরিবেশ নারীবাদের প্রবক্তারা যেমন, বন্দনা শিবা, মারিয়া মাইজ-এর মত একটিভিস্টদের মতে উন্নয়ন ভাবনার কেন্দ্রে স্থাপন করা দরকার নারীর প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও লোকজ জ্ঞান। তবে বাংলাদেশে অন্যান্য আন্দোলনের মত পরিবেশ আন্দোলনের কর্মসূচীতেও নারী অধস্তন অবস্থায় আছে। কর্মসুচীর তাত্ত্বিক ও আদর্শগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নারীর অবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও বৈশিষ্ট্য সেখানে অনুপস্থিত।[৫৬]

আমাদের তাই সময় এসেছে কৃষি, কৃষি প্রতিবেশ এবং কৃষিতে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে আরও বেশি করে আলোচনা করা, নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কাজ করা এবং তার মাধ্যমে জেন্ডার অসমতার নিরসন করা।

ফটো: আনোয়ার হোসেন

কেস স্টাডি

কেস - ১ : তামিলনাডু উইমেন'স কালেক্টিভ

"যদি কেউ একবার রাসায়নিক ব্যবহার করে জমিতে, সে তার জমিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে; কিন্তু যদি কেউ একবার তার জমিতে জিএমও বীজ ব্যবহার করে, তার পক্ষে কখনই ঐতিহ্যগত বীজে ফিরে আসা সম্ভব না ।"

–শিলু ফ্রান্সিস

১৯৯৪ সালে এক লক্ষ বিধবা, ভূমিহীন এবং দলিত নারীদের সমন্বয়ে গঠিত "তামিলনাডু উইমেনস কালেক্টিভ" নারীদের ক্ষমতায়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে । তার মধ্যে কৃষি প্রতিবেশ একটি, যাকে তারা বলছে, প্রাকৃতিক কৃষি বা "Natural farming" অথবা জিরো বাজেট ন্যাচারাল ফার্মিং। যে পদ্ধতি সামনে এনেছে সুভাষ পালেকার । নারীরা গ্রাম পর্যায়ে সংগঠিত হয়ে "সঙ্গম" নামে এবং তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে । কৃষি প্রতিবেশ ছিল তাদের স্বাধীনতা এবং স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির চাবিকাঠি । এটা করতে গিয়ে তারা চারটি বিষয়ে - জমি, প্রথাগত স্থানীয় বীজ, পশু এবং পানিতে নজর দিয়েছিল। যদিও সমিতির সব সদস্যদের এতে অভিগম্যতা এবং জমি লীজ নেবার সক্ষমতা ছিল না । তাদেরকে ঘরের আঙিনায় চাষ করতে উৎসাহিত করা হয় । তারা অবশ্য নিবিড়ভাবে পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি চর্চা করে এবং System of rice intensification (SRI) পদ্ধতি ব্যবহার করে 'জিরো বাজেট ন্যাচারাল ফার্মিং' এর সাথে ।

SRI হচ্ছে একটি কৃষি-প্রতিবেশ পদ্ধতি, যা সেচের জমির চারা, মাটি, পানি ও পুষ্টির সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করে । এই পদ্ধতি ১৯৮০ সালে মাদাগাস্কার-এ প্রবর্তন করা হয় । সংগঠনের সদস্যরা বৃষ্টির পানি এবং সেচের মাধ্যমে চাষ হয় - এই দুইরকম জমিতেই জিরো বাজেট প্রাকৃতিক কৃষির মাধ্যমে চাষ করত । এরকম তাদের দুটো ফার্ম ছিল প্রশিক্ষণের জন্য । এই ট্রেনিং স্পটগুলো নতুন সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য ছিল । এছাড়াও একাধিক কৃষকের মধ্যে মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে কৃষি-প্রতিবেশ, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যসম্মত মাটি সম্পর্কে ট্রেনিং দেওয়া হতো । জৈব সার এবং জৈব কীটনাশক তৈরীতে কৃষকরা প্রশিক্ষিত হতো । তারা স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন উপকরণ ব্যবহার করত । যেমন, গোবর, গোচনা এবং গো-দুগ্ধ; এসবই তাদেরকে বাইরের উপকরণের উপর নির্ভরশীল হওয়া থেকে বিরত রাখতো ।

সংগঠনের মূল ফোকাস ছিল নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে । নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটে থাকে বিভিন্ন দিকে - ঘরের ভিতর, কর্মক্ষেত্রে, মাঠে, জাত–ধর্ম-বর্ণের বিরোধে, একই সঙ্গে পুলিশ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের কারণে। তামিলনাডু উইমেন'স কালেক্টিভ সদস্যরা তাদেরকে কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ দিত এবং যারা গৃহের সহিংসতার এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হতো তাদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে আইনী সহায়তা দিত। সাধারণভাবে নারীর প্রতি সহিংসতা উপস্থাপনে গৃহের অভ্যন্তরে নির্যাতন এবং অসমতাকে সম্পূর্ণভাবে বোঝার জন্য জেন্ডার বিশ্লেষণ করা হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য অংশ ।

সামষ্টিকভাবে কৃষি খামারের মডেল ছিল এই সংগঠনের অন্যতম অর্জন । এক লাখের এক শতাংশ নারীর ছিল নিজস্ব জমি, বাকি অধিকাংশের ছিল লীজ নেওয়া জমি এবং তারা একত্রে শস্য এবং মিলেট উৎপাদন করত । এই মডেল ফার্ম সামষ্টিক খামার, কৃষি-প্রতিবেশ চাষপদ্ধতি এবং বীজ ব্যাংকের প্রদর্শনী খামার হিসেবে তাদের

কাছে উপস্থাপিত হতো, যারা খামার দেখতে আসত। নতুন সামষ্টিক খামার তৈরীতে তারা নারীদের সহায়তা করত। নারী সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে তারা এইভাবে সরাসরি উৎপাদনমূলক সম্পদে এবং ভূমিতে নারীর অভিগম্যতার সমস্যাকে তুলে ধরত। কমিউনিটির অন্যান্য নারীদের সাথে একটুকরো জমি ভাগাভাগি করে চাষ করার মত এই ধরনের সামষ্টিক কর্মকান্ড ছিল নারীদের জন্যে একটা পথ ভূমিতে প্রবেশাধিকার পাওয়ার এবং পরিবারের জন্যে খাদ্য যোগান দেওয়ার। ঋণের সমস্যার সমাধানের জন্য তারা সমষ্টিগতভাবে সঞ্চয় করে। কৃষি–প্রতিবেশ অনুসরণ করে চাষাবাদের মডেল ছিল নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ার একটি মূল দিক। তারা সমষ্টিগতভাবে কাজ করতে গিয়ে শিখেছিল: নতুন কৃষি-প্রতিবেশমূলক টেকনিকসমূহ, সম্পদ সংগ্রহ করা এবং তাদের অধিকারসমূহ আদায় করা ।

শুধুমাত্র নারীদের জন্যে স্পেস তাদেরকে দিয়েছিল উৎসাহ, সাহস, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং নেত্রী হয়ে ওঠার যোগ্যতা। তাদের নেটওয়ার্ক ছিল সুরক্ষামূলক, একটু ন্যূনতম খাবার এবং অর্থনৈতিক/ সামাজিক সহায়তা প্রদান যাতে কেউ চূড়ান্ত দারিদ্র্যে নিপতিত না হয়। তাদের সন্তানেরা তাদের মা বোনকে রোল মডেল হিসেবে দেখেই বেড়ে উঠছিল, যা কমবয়সী নারীদেরকে উৎসাহিত করে ধারাবাহিকভাবে জেন্ডার বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করতে।

এগ্রোইকোলজি বা কৃষি-প্রতিবেশের মাধ্যমে চাষাবাদ প্রবর্তনের আগে নারীদের বেশির ভাগ আয় স্বাস্থ্যগত সমস্যা এবং ওষুধ ব্যবহারে খরচ হয়ে যেতো। সেই কারণে শিলু ফ্রান্সিস এবং তার বন্ধুরা প্রাকৃতিক এবং প্রথাগত ব্যবস্থার মাধ্যমে চাষাবাদ করার সিদ্ধান্ত নেয়। নারীরা তাদের কৃষ্টি ও এলাকার উপযোগী এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ মিলেট চাষ শুরু করে। তামিলনাড়ু উইমেন'স কালেক্টিভ - এর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, মিলেট-এর মত স্থানীয় বীজসমূহ জলবায়ু সহনশীল। মিলেট হচ্ছে স্থানীয় জাতের খাদ্য শস্য। কিন্তু সবুজ বিপ্লবের কারণে মিলেট-এর মিশ্রচাষের বদলে ধান চাষকে প্রবর্তন করা হয়। উল্লেখ্য যে, তামিলনাড়ুর বেশিরভাগ জেলায় পানির স্বল্পতার কারণে ধান চাষ করা সমস্যাজনক। তামিলনাড়ু উইমেন'স কালেক্টিভ তাই মিলেট চাষের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখায় যাতে নারী কৃষকরা পানি স্বল্পতা এবং অপুষ্টির সমস্যায় নিপতিত না হয়।

মিলেট এর উৎপাদনের ফলে এটাও দেখা গেছে যে, এটা ছিল দলিত ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করা এবং জাতের বৈষম্যকে প্রতিহত করার একটা উপায়। শিলু ফ্রান্সিস -এর মতে, মিলেট গরীব জনগোষ্ঠী ও দলিতদের খাদ্য হিসাবে চিহ্নিত ছিল।[৫৭]

> "এটা গরীবদের খাদ্য। মন্দিরে প্রসাদ হিসেবে তারা চাল দিয়ে থাকে। ধান, ধবধবে সাদা চাল - দেবতার খাদ্য হিসেবে দেখা হয়। মিলেট উৎপাদন এবং গ্রহণ প্রান্তিকতায় পর্যবসিত হবার অন্যতম কারণ ছিল এই ধরনের বর্ণবাদী চিন্তা-চেতনা।"

এই সংগঠনের অধিকাংশ নারীরা পরবর্তীতে স্থানীয় নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিল এবং জয়লাভ করেছিল। এটা ছিল একটা পথ তাদের জন্যে প্রশাসনে নারী নেতৃত্ব বৃদ্ধি করার। নারী সংগঠনের এই সকল উদ্যোগের মাধ্যমে শুধুমাত্র কৃষি-প্রতিবেশই প্রবর্তিত হয় নি, নারীদের ঘর-সংসারের এবং অর্থনৈতিক অবস্থানের উন্নতি সাধন করেছিল এবং ভূমিতে তাদের প্রবেশাধিকার দিয়েছিল এবং একই সাথে নেতৃত্ব ও জেন্ডার সমতা বিষয়ে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করেছিল।

কেস - ২ ঃ নয়াকৃষি আন্দোলন

বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলায় ১৯৯০ এর গোড়ার দিকে এই নয়াকৃষির সূচনা হয়।[৫৮] এরও পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে ১৯৮৮ সালের সারা দেশব্যাপী ভয়াবহ বন্যার আক্রমণ। বন্যায় টাঙ্গাইল জেলায় তাঁতী ও কৃষকদের সমস্যা নিয়ে বেসরকারি সংস্থা "উন্নয়ন বিকল্পের নীতি নির্ধারণী গবেষণা" (উবিনিগ) -এর উদ্যোগে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতে প্রাণ ও প্রকৃতির সুরক্ষা ও বিকাশের তাগিদে ১৯৯০ এর দিকে নয়াকৃষি ধারণার উদ্ভব হয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা নিয়ে ভাবনার সমাধানের উদ্যোগ নিতে শুরু করেন গ্রামবাসীরা। এই চর্চার মধ্যে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা সমষ্টির জ্ঞান হিসাবে দানা বাঁধে।

নয়াকৃষি কৃষকদের আন্দোলন। বিভিন্ন কোম্পানীর প্ররোচনায় কৃষিতে বিষ ব্যবহারের যে ভয়ংকর অভ্যাস গড়ে উঠেছে নয়াকৃষি তা বন্ধ করার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে। পরিবেশ. প্রাণ ও প্রাণবৈচিত্রের কোন ক্ষতি না করে চাষাবাদ কিভাবে করা যায় কৃষকদের সেই চেষ্টা থেকে নয়াকৃষি আন্দোলনের জন্ম। কোনপ্রকার সার, বিষ বা কীটনাশক ব্যবহার ছাড়া পরিবেশ অনুযায়ী দেশীয় জাতের বীজ থেকে একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি নয়াকৃষির উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতিতে ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে সেচের জন্য মাটির তলা থেকে পানি তোলা হয় না, বরং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও মাটির ওপরের পানি ব্যবহারের ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং একক চাষের বদলে মিশ্র চাষ করা হয়।

এমন কথা বলা হয় যে, কী করে অধিক খাদ্য উৎপাদন করতে হয় তা জানে 'শিক্ষিত' 'বিশেষজ্ঞ' গোষ্ঠী, যারা আধুনিক জ্ঞান ও টেকনোলজী প্রয়োগের মাধ্যমে কোম্পানীর স্বার্থে কাজ করে। এই ধারণার এটাই উদ্দেশ্য যে, জ্ঞানের জগত এবং অংশীদারিত্ব থেকে কৃষককে দূরে সরিয়ে রাখা। কৃষককে নিছকই ভোক্তা এবং কৃষির উপকরণের ক্রেতায় পরিণত করা। যা কিনা আমাদের খাদ্য ব্যবস্থায় নানান আবাদি-অনাবাদি লতাপাতার ভূমিকাকে নষ্ট করে দেয়।

কৃষকদের এই বিষয়ে সচেতন করার কাজটি করে উবিনিগ। ৫-৬ বছরের মধ্যে হাজার খানেক নারী-পুরুষ কৃষক নয়াকৃষি আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হয়। তারা শুরুতে মিশ্র ফসল চাষ শুরু করে। সেই সাথে শামুক, শ্যাওলা, ঘাস, পানি, বৃষ্টি, মাটি এবং তার সঙ্গে লক্ষ প্রাণের অণুজীবের সঙ্গে চাষাবাদের সম্পর্ক - এই ধরনের জটিল ও অপূর্ব সুন্দর প্রাণের সম্পর্ক জানা ও বোঝার মাধ্যমে চাষাবাদ শুরু করে। এটিই ছিল মূলত: কৃষি- প্রতিবেশমূলক চাষাবাদ।

নয়াকৃষি মনে করে প্রকৃতি একসময় নিজে নিজেই বিবর্তিত হয়েছে এবং মানুষ প্রকৃতির অংশ হয়ে বিকশিত হয়েছে। এখন মানুষকেই নিজের ও প্রকৃতির বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে। পৃথিবীতে প্রাণ ও প্রাণের প্রক্রিয়া বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

কীটনাশক বন্ধ করার জন্য প্রথম থেকেই ঐক্যমত ছিল। বিশেষত নারীরা নিজের ও শিশুদের স্বাস্থ্যের বিপর্যয়ের কথা প্রথম থেকেই বলছিলেন এবং তারা কীটনাশক বন্ধ করার কথা তুলে ধরছিলেন। প্রথম দিকে এ বিষয়ে নেতৃত্বে নারীরাই ছিলেন। তারা সবুজ সার, কম্পোস্ট সার এবং জৈব সার তৈরী এবং ব্যবহার করা শুরু করেন। ফসলের পোকা দমনের জন্যে জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে কৃষকেরা জানলেন যে, কীভাবে ফসলের সাথে কীটপতঙ্গের ব্যবস্থাপনা একীভূত করা যায়। তারা মিশ্র ফসল চাষে সমাধান খুঁজে পেলেন, তাছাড়া দেখলেন যে, জমিতে পাখি বসার জায়গা করে দিলে এবং অন্যান্য প্রাণী থাকলে তারাই পোকা মাকড় খেয়ে ফেলে।

নয়াকৃষি এমনভাবে কাজ করে যাতে মাছ ও জলজ প্রাণী রক্ষা পায়। এছাড়াও কৃষকের নিজস্ব এবং লোকজ জ্ঞান সংরক্ষণ করা, ফসলের পুষ্টি রক্ষা এবং আনন্দের সাথে কৃষিকাজ করা এবং প্রকৃতি এবং সমাজের সকল প্রাণের সাথে আনন্দময় সম্পর্ক রচনা এর লক্ষ্য। এর অর্থ শুধু পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্রভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন নয়, একইসঙ্গে জাত, বর্ণ ও শ্রেণীর বিলোপ ঘটানো এবং নারী -পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে যে অসাম্য আছে তার দূরীকরণও লক্ষ্য। কৃষকের বীজ রক্ষা করা, জিএমও ও হাইব্রীড বীজের বিরোধীতা করা এবং শস্য প্রবর্তনা করা অর্থাৎ ভোক্তার কাছে শস্য পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা। এসবই ছিল প্রকৃতপক্ষে কৃষি-প্রতিবেশকে রক্ষা করার মাধ্যমে চাষাবাদ করা, যা কিনা এখনও অব্যাহত আছে।

কেস - ৩ ঃ পঞ্চগড়ের নারী কৃষকদের আত্ম-উন্নয়নে গণগবেষণা

গণগবেষণার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন যেভাবে বাংলাদেশে হচ্ছে তার দুটি নমুনা এখানে দেয়া হলো। এগুলো রিইব পরিচালিত "দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে মানবাধিকার বাস্তবায়ন কর্মসূচি জোরদারকরণ" (স্ট্রাইভ) প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে নেয়া।

২০১৩ সনে স্ট্রাইভ প্রকল্পের অধীনে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার গণগবেষণা দলসমূহের কার্যক্রম শুরুর সময়ে নারীরা তাদের প্রধান সমস্যা হিসেবে অভাব তথা কর্মসংস্থানের সমস্যাকে চিহ্নিত করেন। বেশ ক'টি মাসিক সভায় তা আলোচনা হয়। সমস্যাটি কিভাবে দূর করা যায়, এতে আমাদের করণীয় কি, কোথায় কার সাথে যোগাযোগ করতে হবে ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথাবার্তা চলতে থাকে। এক পর্যায়ে প্রস্তাব আসে টাকা সঞ্চয়ের। বিপরীতে কথা আসে নগদ টাকা দেওয়া অনেকের পক্ষে সম্ভব নয় এবং তা তাড়াতাড়ি খরচও হয়ে যায়। তারপর প্রস্তাব আসে মুষ্টিচালের; অনেক কথাবার্তা, বিশ্লেষণ করে সকলের মত নিয়ে শুরু হয় মুষ্টিচাল জমানোর কাজ। সমান মাপের প্লাষ্টিকের পাত্র সবাইকে দেওয়া হয়। চাল কিভাবে, কি পরিমাণ কার কাছে, কবে জমা হবে, তাও ঠিক করা হয় দলীয় সভায়। জমার পর চাল বিক্রি করে ব্যাংকে রাখারও সিদ্ধান্ত হয়। তাদের সঞ্চিত টাকা একটি বিশেষ পরিমাণে উন্নীত হওয়ার পর তারা ভাবতে থাকেন, টাকাগুলো কিভাবে বাড়ানো যায়। গাভী ও ছাগল পালনসহ জমি লিজ নেওয়ার কথা আসে দলীয় সভায়। সবদিক বিচার করে সিদ্ধান্ত হয়, জমি লিজ নিয়ে নিজেরাই আবাদ করার। কেউ কেউ বিরোধিতা করেন, কারণ নারীদের মাঠে কাজ করার রীতি এলাকায় নেই। তথাপি ক'জন অগ্রণী সদস্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে গেলেন। জমি লিজ নিয়ে যেদিন বাদাম চাষের জন্য মাটি প্রস্তুত করতে তারা গেলেন, তখন কেউ কেউ যোগ দেননি। উপস্থিত সকলেই ইতস্তত করছিলেন নতুন কাজটি কিভাবে শুরু করবেন। তখন কাজলী স্কুলের শিক্ষিকা জয়ন্তী রাণী কোদাল হাতে নিয়ে কাজ শুরু করে দেন, নেমে পড়েন সবাই। কাজ শেষে মাঠেই সিদ্ধান্ত হয় যারা কাজে আসবে না, তাদেরকে দল থেকে বাদ দিতে হবে। অবশেষে সকলেই কাজে যোগ দেন।

সেই থেকে সূচিত হল পঞ্চগড়ের নারীদের বাদাম চাষ ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সফল উদ্যোগ। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সারা বছর পর্যায়ক্রমে আলু, টমেটো, মরিচ, সরিষা প্রভৃতির চাষাবাদ করে যাওয়ার। নগদ টাকা হাতে পেয়ে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের স্বামীরাই সকলে এখন প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

কেস-৪ ঃ নারী-পুরুষ মজুরী বৈষম্য হ্রাসে মুণ্ডা নারী গণগবেষকদের সাফল্য

সুন্দরবন ও বঙ্গোপসাগর পরিবেষ্টিত সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার বেশ কিছু গ্রামে আদিবাসী মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন প্রকার অধিকারের সাথে তাদের কোন পরিচয়ই যেন ছিল না- তাই সামাজিক দুঃস্থতার মাঝে যেন তাদের স্থান হচ্ছিল না। নারী-পুরুষ, যুব-কিশোর নির্বিশেষে সকলেই এখানে হাড়ভাঙ্গা দিনমজুর; নারীদের শ্রমের রকম-প্রকৃতি দেখলে যে কারোর বিবেকে ধাক্কা লাগতে পারে, তাও অবিশ্বাস্য বৈষম্যমূলক মজুরীতে। উপজেলার ৭নং মুন্সীগঞ্জ ও ৮নং ঈশ্বরীপুর ইউনিয়নের ৬টি গ্রামে প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পর একে একে এ সকল সমস্যার কথা ওঠে আসে। সামষ্টিক চিন্তার ক্ষেত্ররূপে গণগবেষণায় তারা আগ্রহী হন। পরবর্তীতে গণগবেষণা, তথ্য অধিকার, মানবাধিকার, ভূমি অধিকারসহ নানা জীবন-ঘনিষ্ঠ কর্মশালা ও সেমিনারে সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে তাদের চিন্তা-চেতনা এক নবতর রূপ ধারণ করে সমাজকে বিবেচনা করার যেন নতুন উপাদানের সন্ধান পেলেন তারা।

সুন্দরবন অঞ্চলে নারী-পুরুষ একই ধরনের কাজ করলেও অজ্ঞাত কারণে নারীর মজুরী পুরুষের অর্ধেক অর্থাৎ পুরুষের ২০০/= ও নারীর ১০০/= টাকা। বিষয়টি নিয়ে মালিকদের সাথে নারীরা বৈঠকে বসে সঞ্জুলী মুণ্ডা, বিমলা মুণ্ডা, মালতী মুণ্ডা প্রমুখ গণগবেষক বুঝানোর চেষ্টা করেন। মালিকরা বিবেচনার আশ্বাস দেন। কিন্তু পাশাপাশি বসবাসরত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর নারীরা (যেমন মন্ডল, ঋষি, ক্ষেত্রবিশেষে মুসলিমও) চলমান মজুরীতে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। আর মুণ্ডা নারীরা কাজ হারাতে থাকে। ভাল করতে গিয়ে খারাপ ফল! মুণ্ডা নারীরা বসলেন মিটিং-এ। সিদ্ধান্ত হল, অন্যান্য জনগোষ্ঠীর শ্রমজীবী নারীদের সাথে বসে আলোচনা করার। আলোচনা সফল হল। তারপর সকল শ্রমজীবী নারী একত্রিতভাবে মালিকদের সাথে কথা বলেন। সমবেত প্রচেষ্টায় প্রথমদিকে নারীদের দৈনিক মজুরী ২০/= টাকা বৃদ্ধি পায়। এরই ধারাবাহিকতায় এখন মজুরীর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে পুরুষ ২০০/= টাকা ও নারী ১৫০/= টাকা। তাদের এই দেন-দরবার অব্যাহত রয়েছে, যাতে মজুরী আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ফটো: আনোয়ার হোসেন

তথ্যসূত্র

১. Altieri, M.A., 2015, Agroecology : Key Concepts, Principles and Practices, Penang: Third World Network

২. ফরহাদ মজহার, প্রাণ ও প্রকৃতি, আগামী প্রকাশনী, ২০১১, পৃ-২৪-২৫

৩. Thapa, Parul L., Making Agroecology Viable for Small farmers, Experiences from the Field, Focus on the Global South, (FOGS), 2014, P. 10-12

৪. "Agroecology and the right to food" un Special Raprorteur on the Right to food, 2011

৫. Altieri, M. A. 2009, "Agroecology, Small farms and Food Sovereignty, University of California at Berkeley, Monthly Review, Volume-6, Issue-3, July - August 2009

৬. Andersen, M. L. Thinking about Women: Sociological Perspectives on Sex and Gender. Macmillan Publishing Company, 1988, p. 75

৭. Renzetti, C. M. & Curren, D. J. Women, Women, Men and Society : The Sociology of Gender; Chapter One : Studying Gender : An Overview, Allyn and Becon, Boston, 1989, p.8

৮. Beneria, Lourds and Sen, Gita, Accumulation and Reproduction and Woman's Role in Economic Development, Boserup Revisit, Sign, Vol. 7. No. 2, Development and the Sexual Division of Laboour (Winter, 1981) p. 279-298

৯. Brydon, Lynne & Sylvia Chant; Women in the Third World : Gender Issues in Rural and Urban areas, Edward Elgar Publishing Limited, England, 1989, pp. 7-8

১০. Purnima and Mamidipudi, , Women Famers : Rights and Identity, Ahmedabad. 2015

১১. Bearak, M. 2016, Why terms like 'transgender' don't work for Indias 'third-gender' communities-The Washington Post [online]. https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/04/23/why-terms-like- 'transgender' - don't-work- for- Indias-third-gender- communities/?utm_term= .9c5790db747e [Accessed 14 May 2017]

১২. Consultation paper on Legal Gender Recognition, jointly organized by National Human Rights Commission (NHRC) and Bandhu, 07 November 2017

১৩. Koester, D., gender and Power [online] . Developmental Leadership Program, Available from: http://publications.dlprog.org/Gender&Power.pdf, 2015 [Accessed 14 May 2017]

১৪. Lukes, S. 2005, Power: A Radical View, Palgrave, Macmillan

১৫. Purnima and Mamidipudi, op. cit, 2015

১৬. Ibid, 2015

১৭. Livne, E. 2015. Violence Against Women in India, Perpetuation and Reform, Carnegie Mellon University

১৮. Comanne, D, 2010, How Patriachy and Capitalism Combine to Aggravate the Oppression of Women [online]. cadtm.org. Available from : http://www. cadtm.org/How-Patriachy-and- Capitalism#nb2 [Accessed 9 March 2017]

১৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন ও বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২০. Huq, Moshreka A. & Azad, Ashraful, Four Decades of Women in Bangladesh: Changes and Challenges in Empowerment and Development, Journal of Indian Research, Vol 1. No.3. 23-34, July- September, 2013, ISSN No. 2321-4155

২১. Das, L. 2015, Work Participation of Women in Agriculture in Odisha, IOSR lour Journal of Humanities and Social Science ver.III,20(7),66-78

২২. Boserup, E, Women's Role in Economic Development, Earthscan Publications, 1970

২৩. IFOAM. 2007, Organic Agriculture and Gender Equality.

২৪. Gura, S. 2013, Agropoly - A handful of corporations control world food production.

২৫. বাংলাপিডিয়া, খন্ড-১, পৃঃ ৩৭৯ - ৩৮১, ভূক্তি-কৃষি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩

২৬. IFDC Report, Vol. 37, No. 3 (2012)

২৭. মেঘনা গুহঠাকুরতা, বাংলাদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তর, মূল প্রবন্ধ, বাংলা একাডেমী, ০৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩

২৮. Jaim, W.M.H and Hossain, Mahbub, Women's participation in Agriculture in Bangladesh 1988-2008 : Changes and Determinants, Paper presented in the pre-conference event on "Dynamics of Rural Livelihoods and Poverty in South Asia" 7th Asian Society of Agricultural Economics (ASAE), International Conference Hanoi, Vietnam, October 12, 2011.

২৯. Shiva, V. 1991. Most farmers in India are women, Delhi: FAO

৩০. মহিলা পরিষদ, ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড, ঢাকা, ২০১৩

৩১. Sircar, A.K. and S. Pal, 2014, What is preventing women from inheriting land? A study of the implementation of the Hindu Succession (amendment) Act 2005 in three states in India. In : World Bank Conference on land and poverty, Washington DC: The World Bank

৩২. Oxfam. 2016, Mobilising Women Farmers to Secure Land Rights in Uttar Pradesh [online] Oxfam India. Available from: http://oxfamindia.org/sites/default/files/OIA-Mobilising-Women-Farmers-to-Secure-Land-Rights-in-Uttar-Pradesh-12032016-EN.pdf[Accessed 14 may 2017]

৩৩. FAO, Gender, Key to Sustainability and Food Security, Plan of Action: gender Development, FAO, Rome, 2003

৩৪. কর্মজীবী নারী, কৃষির রং তুলিতে শ্রমিকের দিন যাপন-২, কৃষি শ্রমিকের লড়াই-সংগ্রামের গল্প, ভূমিকা, ২০১৩

৩৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন ও বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

৩৬. World Bank, FAO, and IFAD. 2015, Gender in Climate-smart agriculture: module 18 for gender in agriculture sourcebook.

৩৭. Pimbert, M. 2015, Agroecology as an Alternative Vision to Conventional Development and Climate-smart Agriculture. Development, 58(2-3), 286-98

৩৮. Nicholls, C.I. 2014, Reflections on the FAO's International Symposium on Agroecology for Food Security and Nutrition: [online] Food First, Available from : https://foodfirst.org/reflections-on-the-faos-international-symposium- on-agroecology-for-food-security- and-nutrition[Accessed 14 may 2017]

৩৯. World Bank, FAO, and IFAD. 2015, Gender in Climate-smart agriculture: module 18 for gender in agriculture sourcebook.

৪০. Hall, A. and V. Mogyorody, 2007, Organic Farming, Gender and the Labour Process, Rural sociology. 72(2), 289-316

৪১. Mcmahon, M. 2004, Gender and Organic Agriculture: A Local and Partisan Position, In: First annual Conference for Social Research in Organic Agriculture. Guelph, Ontario

৪২. Sumner, J. and S Llewelyn, 2011. Organic Solutions? Gender and Organic Farming in the Age of Industrial agriculture, Capitalism Nature Socialism, 22(1), 100-18

৪৩. Machin Sosa, B., A.M.Roque Jaime, D.R.Avila Lozano, and P. Rosset, 2010, Revolucionagroecologica: El Movimiento de Campesino a Campesino de la ANAP, Havana: ANAP and La ViaCampesina

৪৪. Khadse, A., P.M. Rosset, H Morales and B.G Ferguson. 2017 Taking agroecology to scale: the Zero Budget Natural farming peasant movement in Karnataka, India. The Journal of Peasant Studies, 1-28

৪৫. Agarwal, B. 2010, Rethinking Agricultural Production Collectivities: The Case for a group approach to energize agriculture and empower poor farmers, EABER. No. 305

৪৬. Agarwal, B. 2014, Food Sovereignty, food security and democratic choice: critical contradictions, difficult conciliations, The Journal of Peasant Studies,41(6). 1247-1268

৪৭. Mi Young Park, C. and B. white. 2014. We Are Not All the same: Taking Gender Seriously in Food Sovereignty Discourse. Food Sovereignty: A Critical Dialogue

৪৮. Purnima and Mamidipudi, op. cit, 2015

৪৯. Amrita Bhoomi, 2017, What do love letters have to do with farming? [online]. amritabhoomi.org. Available from; https//amritabhoomi.org/what-do-love-letters-have-to-do-with-farming/[Accessed 15 May 2017]

৫০. Schwendler, D.F. and L.A. Thompson, 2017. An education in gender and agroecologyin Brazil's landless Rural Workers' Movement. Gender and Education, 29(1), 100-14

৫১. মেঘনা গুহঠাকুরতা, গণগবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ণ, অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, ২০১৬

৫২. Begum, Suraiya, Co-author, *Gonogobeshona*, Encyclopedia of Action Research, Sage Publication, 2014

৫৩. Freire, P. Cultural Action for Freedom, Penguin Books, London, 1972

৫৪. Rosset, P.B.M Sosa, A.M.R Jaime and DRA Lozano, 2011, The Campesino-to- Campesinoagroecology movement of ANAP in CUBA: social process methodology in the construction of sustainable peasant agriculture and food sovereignty, The Journal of Peasant Studies38(1), 161-91

৫৫. Machin Sosa, B., A.M.R. Jaime, D.R.A Lozano, and P. Rosset, 2013, Agroecological revolution: The Farmer-to-Farmer Movement of the ANAP in Cuba, Havana: ANAP and La ViaCampesina

৫৬. নাসিম বানূ, "পরিবেশ ও নারী : একটি পর্যালোচনা", আল মাসুদ হাসানউজ্জামান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের নারী, বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২

৫৭. Quinn-Thibodeau, T. 2015, Agroecology leading the flight against India's Green Revolution - The ecologist [online]. Availablefrom:https://www.theecologist.org/interviews/ 2985620 /agroecology _leading _the_fight_against_indias_green_revolution.html[Accessed 15 May 2017]

৫৮. নয়াকৃষি আন্দোলন, উবিনীগ, ০৭ ডিসেম্বর, ২০১৫. [online]. ubinig.org/index.php/network/ printAerticleNayakrishi/15/27 [Accessed :18 December 2017]

Research Initiatives, Bangladesh (RIB)

Research Initiatives, Bangladesh (RIB) was founded to promote knowledge on poverty alleviation that is relevant, useful, innovative, participatory and action oriented, with a special focus on marginalized and socially excluded communities. RIB views poverty as a multidimensional process and recognizes that the needs of poverty groups go beyond simple income generation, food and shelter, to areas such as equality, dignity, justice, human rights and good governance. RIB supports marginalized and minority groups who are unable to access basic services due to social discrimination and conduct people's research (*Gonogobeshona*) on the development schemes that affects them most, in order to develop ownership and generate community mobilization.

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS)

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) is a political foundation from Germany that works within the tradition of workers' and women's struggles. Bearing the name of Democratic Socialist Rosa Luxemburg (1871-1919), the foundation serves as a forum for debate and critical thinking about political alternatives, as well as a research centre for progressive social development. RLS promotes the discourse among activists, scientists and intellectuals from South Asia and Germany as well as from other regions of the world. A special focus lies on creating networks among countries of the Global South. The foundation also provides space for critical discourse and publishes educational material.

For more information please visit : www.rosalux.in